দশম অধ্যায়

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন

অভিজিৎ রায় এবং বন্যা আহমেদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আবারও কোর্ট কাচারি পর্যন্তই গড়ালো, যদিও আমেরিকার জন্য সেটা নতুন কোন ব্যাপারই নয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ডোভার শহরের সরকারী স্কুল বোর্ড বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে বিবর্তনবাদের পাশাপাশি সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে সেখানকার আভিভাবকেরা তার বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হন। কোর্টের জজ *জন ই. জোন্স* বিস্তারিতভাবে আইডির প্রবক্তা এবং আইডির বিপক্ষে দাঁড়ানো প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানীদের বক্তব্য শোনার পর ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রায় দিলেন - আদালতের সাক্ষী থেকে দেখা যাচ্ছে যে আইডি ধর্ম এবং সৃষ্টিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি মতবাদ, তাই সরকারী কোন স্কুলের পাঠ্যসুচীতে একে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তটি পরিষ্কারভাবে আমেরিকার সাংবিধানিক আইনকে (Establishment Clause, আমেরিকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর এই অংশটিতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, সরকার কোনভাবেই কোন ধর্মের পক্ষে বা তা প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন আইন তৈরি করবে না) লংঘন করে। জজ সাহেব আরও বললেন, এই মামলা থেকে এও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে যে, বিবর্তনবাদ একটি যথার্থ বিজ্ঞান এবং তা বৈজ্ঞানিক মহলে বহুলভাবে সমর্থিত, এই তত্ত্বের সাথে কোন আলৌকিক স্রষ্টা আদৌ আছে কি নেই তার কোন দ্বন্দ্ব নেই [১]।

কিন্তু জজ সাহেব বললে কি হবে, আজকে আমেরিকার অত্যন্ত রক্ষণশীল কিন্তু ক্ষমতাবান খ্রীষ্টান মৌলবাদী

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) বলতে কি বুঝায়?

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে 'ক্রিয়েশন সায়েন্স' বা ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে 'অবৈজ্ঞানিক' এবং 'রিলিজিয়াস ডগমা' হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়ার পর পরই সৃষ্টিবাদীরাও বুঝে গিয়েছিলেন যে সেই পুরনো সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে বোধ হয় আর জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। ফলে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য মূলতঃ তখন থেকেই তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো আরেকটু 'সফিসটিকেটেড' তত্ত্বের। সম্প্রতি তাদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারণা করে নতুন মোড়কে 'সেই একই পুরোন সৃষ্টিতত্ত্ব'কে হাজির করা হয়েছে, যার নাম হচ্ছে সৃষ্টির 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' (Intelligent Design argument), বা সংক্ষেপে আইডি। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, ফিলিপ জনসন, জোনাথন ওয়েলসসহ প্রবক্তাদের সকলেই মোটা অঙ্কের অর্থপুষ্ট রক্ষণশীল খ্রীষ্টান সংগঠন *ডিস্কভারি ইন্সটিটিউটের* (Discovery Institute) সাথে যুক্ত। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং সর্বোপরি জৈব জীবন এতই জটিল এবং অনন্যসাধারণ যে প্রাকৃতিক উপায়ে সেগুলো উদ্ভুত হতে পারে না, এবং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনার ছাপ আছে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পিছনে খ্রীষ্টিয় ঈশ্বর জড়িত থাকবার ব্যাপারটা মুখ ফুটে সরাসরি না বললেও তাদের বিভিন্ন লেখালখিতে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তারা বলেন, বৈজ্ঞানিক ডেটা বা উপাত্তগুলো শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিংবা উচিৎ ও নয়, এগুলোকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে তখনই, যখন এক সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বার (intelligent agent) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে এগুলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে। এই 'আইডি' ইদানিংকালে কারো কারো কাছে এতটাই গুরুত্ব পেয়েছে যে, তাঁরা অনেকেই এই তত্ত্বটিকে বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করে (মুলতঃ ডারউইনীয় বিবর্তনের বিকল্প হিসেবে) স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান, এবং এ নিয়ে আমারিকায় আন্দোলনও শুরু করেছেন।

অংশ এবং সরকার তো তা বলছে না। এই তো সেদিনও তাদের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ দিব্যি বলে দিলেন যে, স্কুলে আইডি এবং বিবর্তন দুটোই নাকি সমানভাবে পড়ানো উচিত। *সাইন্টিফিক আমেরিকান* জার্নালের অকটোবর, ২০০৬ সংখ্যার এক জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, এদেশের রক্ষণশীল রিপাবলিকান দলের ৬০%ই হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত্ববাদী এবং মাত্র ১১% বিবর্তনবাদে আস্থা রাখে, আর ওদিকে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ২৯% সৃষ্টিতত্ত্ববাদী এবং ৪৪% বিবর্তনবাদকে সঠিক বলে স্বীকার করে। উদারনৈতিক (liberal) প্রগতিশীল আমেরিকানদের মধ্যে ৬৩%, কিন্তু রক্ষণশীল অংশের মাত্র ৩৭% বির্বতনবাদকে মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানের সঠিকতা কি তবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেই নির্ধারিত হবে? কিন্তু অন্য কোন বৈজ্ঞানিক আবিস্কার যেমন বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব, টেলিস্কোপ থেকে শুরু করে মাধ্যাকর্ষণ, আপেক্ষিক তত্ত্ব কিংবা বিগ ব্যাং- কোনটিকে প্রতিষ্ঠিত করতেই কিন্তু রাজনৈতিক দলের কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর করুণা বা সম্মতির দরকার পড়েনি! সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আমেরিকার জনগণের ৮২ শতাংশ সত্যিকারের স্বর্গে বিশ্বাস করে, এমনকি শতকরা ৫১ ভাগ ভুতে পর্যন্ত বিশ্বাস করে, আর সে তুলনায় বিবর্তনের মত বৈজ্ঞানিক একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করে মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ লোক [২]। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের নভেম্বর, ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'Was Darwin Wrong?' প্রবন্ধ থেকে দেখা যায় যে, ৪৫% আমেরিকান এখনও মনে করে যে, সৃষ্টিকর্তা গত ১০ হাজার বছরে কোন এক সময়ে মানুষকে এভাবেই বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী ডগলাস ফুটুইমা তার 'Evolution' বইয়ে লিখেছেন যে, শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী আমেরিকান এখনও মানুষের বিবর্তনে বিশ্বাস করে না, অথচ ওদিকে ইউরোপের বেশিরভাগ মানুষ বিবর্তনবাদকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানে এত অগ্রসর বলে কথিত আমেরিকানদের বিবর্তন সম্পর্কে আস্থার অবস্থা দেখে ইউরোপবাসীর অনেকেই নাকি বিস্মিত না হয়ে পারে না [৩]। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীল চার্চের সাথে বিজ্ঞানের দন্দ্ব, শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী উপনিবেশের অবসান ইত্যাদি থেকে পাওয়া শিক্ষার কারণেই হয়তো ইউরোপবাসীরা আজকে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অগ্রসর ভুমিকা নিতে সক্ষম হয়েছে। নিউ সাইন্টিস্ট মাগ্যজিনে বক্তব্য দিতে গিয়ে মিশিগান ইউনিভারসিটির শিক্ষক জন মিলার বলেন যে, (উন্নত দেশগুলোর মধ্যে) আমেরিকাই মনে হয় একমাত্র দেশ যেখানে বিবর্তনবাদ নিয়ে এই রক্ষণশীল ক্ষমতাশালী অংশ রাজনৈতিক খেলায় মেতেছে, পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশেই এটা আর কোন ইস্যুই নয় [৪]। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জেনেটিক্সসহ আধুনিক জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে যেখানে সারা পৃথিবীতে ক্রমশঃ মানুষের মধ্যে বিবর্তনের পক্ষে সমর্থন বাড়ছে সেখানে এই রাজনৈতিক খেলার শিকার হয়ে আমেরিকায় তা কমতির দিকে। খুবই আবাক লাগতে ভাবতে যে, আজকে যদি আমেরিকার সরকার এবং ক্ষমতাশালী অংশের এই অবস্থা হয় তাহলে প্রায় দু'শ বছর আগে এ দেশের প্রতিষ্ঠাতা রাজনীতিবিদেরা কি করে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করতে পেরেছিলো? এখন তো মনে হচ্ছে এদেশের পূর্বসুরীদের অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই হয়তো এখনও আমেরিকার স্কুল কলেজে বিজ্ঞান টিকে আছে! তাহলে কি আমরা বলব যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকা ক্রমাগতভাবে উদারনৈতিক অগ্রসরতা থেকে পিছিয়ে পড়ছে? হতেই পারে। তবে আরো একটা জিনিস এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোন দেশে বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার ঘটলেই সেখানে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে ওঠে না, বিজ্ঞানমনস্কতার জন্য চাই এমন এক সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সচেতন জনগোষ্ঠী যাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

এতক্ষণ তো দেখলাম আমেরিকার মত উন্নত দেশে বিবর্তনবাদের কি অবস্থা। ইদানিং কালে শুধু তো আমরিকায়ই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হারুন ইয়াহিয়াদের (তূর্কী দেশীয়) মত স্বঘোষিত 'বিজ্ঞানী'রাও

আবার আইডি সমর্থন করতে শুরু করেছেন। তারা আইডির সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে নিজেদের সৃষ্টিতত্ত্ব মিলিয়ে বিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন। আর ওদিকে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কথা বোধ হয় আর না বলাই ভাল। দৈনিক সমকালে কালস্রোত বিভাগে এ বছর (২০০৬ সাল) মাসাধিক কাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে হুমায়ুন রশীদের লেখা 'বাংলাদেশে কি বিবর্তন পড়ানো হচ্ছে?' নামের একটি সিরিজ। ওই সিরিজে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে করুণ ছবি ফুটে উঠেছে তা সত্যই ভয়াবহ। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তো বটেই, এমনকি জীববিজ্ঞানের স্বনামধন্য শিক্ষক শিক্ষিকারাও বিবর্তনকে ধর্মবিরোধী আজগুবি ধ্যান ধারণা বলে মনে করেন। তারা মনে করেন পরীক্ষা পাশের জন্য এসব 'হাবি জাবি' জিনিস পড়া যেতে পারে, কখনই ওগুলো সত্য বলে মেনে নেওয়া যাবে না! [৫]

বিবর্তনবাদ নিয়ে রক্ষণশীল মহলে এত হৈ চৈ কেনো?

বিবর্তনবিরোধীরা ডারউইনিজমকে শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি, সমস্ত 'শয়তানির চাবিকাঠি' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। আমেরিকার রক্ষণশীল অংশের মদদপুষ্ট ডিস্কভারি ইন্সটিউটের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টেইলজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনের মতে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভুত হয়েছে, সেহেতু তারা যে কোন ধরনের 'নাফরমানি' করতে পারে - সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফি, তালাক, গণহত্যা সবকিছু [৬]! এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল! 'আনসারিং জেনেসিস' নামে একটা মৌলবাদী খ্রীষ্টান ওয়েবসাইট আছে, যারা এখনো মনে করে পৃথিবীর বয়স ছ'হাজার বছরের বেশী নয়। এ ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কোন উপায়ে বিবর্তনকে ঠেকানো আর 'প্রমাণ করা' বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, বাইবেলে যা লেখা আছে তাই ঠিক[৭]। তারা খুব সুন্দর করে চার্ট বানিয়ে দেখিয়েছে বিবর্তন মানলে পাওয়া যাবে রেসিজম, ফ্যাসিজম, কমিউনিজম, নাজিজম আর জেনেসিস মানলে এ পৃথিবীতে থাকবে প্রেম ভালবাসা, স্নেহ, মায়া আর মমতা! ওদিকে হারুন ইয়াহিয়ার মত ব্যক্তিরা আবার দিব্যি বলে বেড়াচ্ছেন যে, বিবর্তনবাদ পশ্চিমা-আধিপত্যবাদী শক্তির দ্বারা সৃষ্ট একধরণের 'প্রতারণা' ছাড়া নাকি আর কিছুই নয়!

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে সব ছেড়ে ছুড়ে বিবর্তন তত্ত্বের উপর এই বিশেষ মহলটির এতো আক্রোশ কেন? বিজ্ঞানের তো আরো হাজারটা শাখা আছে, কই সেগুলো নিয়ে তো এমন 'উদ্দেশ্যমূলক' ভাবে বিতর্ক তৈরী করা হচ্ছে না? এমনকি জীববিজ্ঞানের ভিতরেও তো আছে কোষবিদ্যা, বংশগতিবিদ্যা, সাইটোজেনেটিক্স কিংবা আণবিক জীববিদ্যা ইত্যাদি। ওগুলো নিয়েও বিশেষ মহলটির কোন মাথাব্যথা নেই, বিতর্কও নেই। তাহলে নিশ্চয়ই ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মধ্যে তারা এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যা তাদের গায়ে ভিষণ জ্বালা ধরানোর জন্য যথেষ্ট। কি সেটি? আসলে সত্যি বলতে কি, বিবর্তনতত্ত্ব সমস্ত পুরোন সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারের বুকে তীব্র আঘাত হেনেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মের মূল ভিত্তি সৃষ্টিতত্ত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে বিবর্তনবাদ।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই নিজের জন্ম রহস্য নিয়ে মানুষ বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে এসেছে। যুগে যুগে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাই জন্ম হয়েছে নানা ধরণের ধর্মের এবং সৃষ্টিতত্ত্বের। তবে পশ্চিমা বিশ্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উইলিয়াম প্যালের কল্যাণে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে সৃষ্টির পরিকল্প যুক্তি (Design argument) প্রবলভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্বই ১৮৫৯ সালে প্রথমবারের মতো একে শক্তিশালীভাবে চ্যালেঞ্জ করে ভুল প্রমাণিত করলো। বিবর্তনবাদ খুব পরিস্কার

ভাবেই দেখিয়ে দিল যে, মানুষসহ বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তন এবং উদ্ভবের পেছনে কোন স্বর্গীয় কারণ খোঁজার দরকার নেই। অন্যান্য পশুপাখি, গাছপালা যে পদ্ধতিতে পৃথিবীতে এসেছে, মানুষ নামের 'দ্বিপদী প্রাণী'টিও ঠিক একই বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এ পৃথিবীতে এসেছে। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ আসলে প্রাণীজগতের অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়, তা সে নিজেকে যতই 'অনন্য সাধারণ' মনে করুক না কেন! দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট এজন্যই বিবর্তনতত্ত্বকে 'ইউনিভার্সাল এসিড' (universal acid) বা রাজাম্ল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন[৮]। ইউনিভার্সাল এসিড যেমন তার বিধ্বংসী ক্ষমতায় সকল পদার্থকে পুড়িয়ে-গলিয়ে ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমস্ত প্রথাগত সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারকে একেবারে দুর করে দিতে পারে। অধ্যাপক ডেনেট তার বিখ্যাত বইটিতে[৮] বিবর্তন তত্ত্বকে 'ডারউইনের বিপজ্জনক প্রস্তাব' (Darwin's dangerous idea) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি 'বিপজ্জনক' কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য জীব কোন সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা ছাড়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল প্রাণ থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভুত হতে পারে। নিঃসন্দেহে এটি সৃষ্টিবাদীদের জন্য বিপদের কথা। অক্সফোর্ডের বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স (Samuel Wilberforce), যিনি ডারউইনের বন্ধু বিজ্ঞানী হাক্সলির সাথে ঝগড়া-ঝাটির কারণে বিখ্যাত হয়ে আছেন (২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), সঙ্গত কারণেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনকে অস্বীকার করেন এই বলে[৯]: 'প্রাকৃতিক নির্বাচন নামের তত্ত্বটি ঈশ্বরের বাণীর সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটি বরং ঈশ্বরের সৃষ্টির সাথে ঈশ্বরের প্রেরিত বাণীর বিরোধ ঘটায়।'

সে যাই হোক, চলুন এবার দেখা যাক আজকের রক্ষণশীল আমেরিকাবাসীদের কাছে 'হট্ কেক' ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বটি আসলে কি বলতে চাইছে, এই তত্ত্বটিকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টার পিছনে আসলে কি উদ্দেশ্য কাজ করছে। এর মুলে যেতে হলে আমাদেরকে আইডি তত্ত্বের আস্তানা ডিস্কভারি ইনস্টিটিউটে একবার ঢুঁ মেরে আসতে হবে। ওখানে কারা কালকাঠি নাড়ছেন, কি বলছেন এবং কেন বলছেন তা একটু খতিয়ে দেখলেও বোধ হয় ডোভার শহরের জজ সাহেবের দেওয়া সাম্প্রতিক রায়ের অর্থ পরিস্কার হয়ে যাবে। কিন্তু আইডি প্রবক্তাদের জন্ম রহস্যটা ঠিকমত বুঝতে হলে আমাদেরকে আরেকটু দুরে যেতে হবে, চোখ রাখতে হবে সেই আঠারো শতকে, উইলিয়াম প্যালের কালে। সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাসের বইটার সে সময়কার পাতাগুলো একটু ভালোমত উলটে পালটে দেখতে হবে কারণ তাদেরই উত্তরসুরি হিসেবে জন্ম হয়েছে এই নব্য আইডি প্রবক্তাদের!

উইলিয়াম প্যালে এবং তার পরিকল্পিত সৃষ্টির যুক্তি

উইলিয়াম প্যালে (১৭৪৩-১৮০৫)'র বিখ্যাত বই 'Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearences of Nature' প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও প্যালে ভেবেছিলেন বিস্তর, কিন্তু নিজেই শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন 'বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান উপযুক্ত মাধ্যম নয়' [১০] ; এ ক্ষেত্রে প্যালের 'উপযুক্ত মাধ্যম' মনে হয়েছিল বরং জীববিজ্ঞানকে। আর পূর্ববর্তী অন্যান্য *ন্যাচারাল থিওলিজিয়ান*দের মতই প্যালেও জীবজগতকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জীবের অভিযোজনের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্যালে লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রতিটি জীবদেহে নির্দিষ্ট কাজ করবার জন্য নির্দিষ্ট অংগ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা জীবটিকে একটি নির্দিষ্ট কোন পরিবেশে টিকে থাকতে সহায়তা করে। তিনি জটিল জীবদেহকে ঘড়ির কাঠামোর সাথে তুলনীয় মনে করেছিলেন, আর তার মধ্যেই দেখেছিলেন স্রষ্টার সুমহান পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য আর

নিপুণ তুলির আঁচর। প্যালের ভাষাতেই [১১] :

> ‘ধরা যাক ঝোপঝারের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ আমার পা একটা পাথরে লেগে গেল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এই পাথরটা কোত্থেকে এলো? আমার মনে উত্তর আসবে- প্রকৃতির অন্য অনেক কিছুর মত পাথরটাও হয়ত সবসময়ই এখানে ছিল। ... ...কিন্তু ধরা যাক আমি পথ চলতে গিয়ে একটা ঘড়ি কুড়িয়ে পেলাম। এবার কিন্তু আমার কখনই মনে হবে না যে ঘড়িটিও সব সময়ই এখানে পড়ে ছিল।’

নিঃসন্দেহে ঘড়ির গঠন পাথরের মত সরল নয়। একটি ঘড়ি দেখলে বোঝা যায়- ঘড়ির ভিতরের বিভিন্ন ছোট ছোট অংশগুলো কোন এক কারিগর এমনভাবে তৈরী করেছেন যেন সেগুলো সঠিকভাবে সমন্বিত হয়ে কাঁটাগুলোকে ডায়ালের চারপাশে মাপমত ঘুরিয়ে ঠিক ঠাক মত সময়ের হিসেব রাখতে পারে। কাজেই পথে ঘড়ি কুড়িয়ে পেলে যে কেউ ভাবতে বাধ্য যে ওখানে আপনা আপনি ঘড়ির জন্ম হয়নি বরং এর পেছনে একজন কারিগর রয়েছেন যিনি অতি যত্ন করে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঘড়িটি তৈরী করেছেন*। একই যুক্তিমালার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে প্যালে বেছে নিয়েছিলেন আমাদের জীবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংগ চোখকে। চোখ নামের এই অংগটিকে প্যালে ঘড়ির মতই এক ধরনের জটিল যন্ত্র হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, কারণ তার মতে, ‘ ঘড়ির মতই এটি (চোখ) বহু ছোট-খাট গতিশীল কলকব্জা সমন্বিত এক ধরণের জটিল যন্ত্র হিসেবে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়, যেগুলোর প্রত্যেকটি একসাথে কাজ করে অংগটিকে কমর্ক্ষম করে তুলে।’ [১২]।

চোখকে প্যালে অনেকটা জৈব-টেলিস্কোপ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ঘড়ি কিংবা টেলিস্কোপ তৈরী করার জন্য যেহেতু একজন কারিগর দরকার, চোখ ‘সৃষ্টি করার জন্য’ও প্রয়োজন একজন অনুরূপ কোন কারিগরের। সেই কারিগর যে একজন ‘ব্যক্তি ঈশ্বর’ (Personal God)ই হতে হবে তা প্যালে খুব পরিস্কার করেই বলেন [১১] :

> ‘কোন পরিকল্পনাকারী (Designer) ছাড়া কোন পরিকল্পনা (Design) হতে পারে না, যেমনি আবিস্কর্তা ছাড়া কোন আবিস্কার হতে পারে না।... ...পরিকল্পনার ছাপ এতোই প্রবল যে একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনাকারীকে অবশ্যই একজন ব্যক্তি হতে হবে। সেই ব্যক্তিই হচ্ছেন ঈশ্বর।’

———————————————————

* প্যালের এই ‘ঘড়ির কারিগরের যুক্তি’ দর্শনশাস্ত্রে পরিচিত হয়ে আছে ‘পরিকল্প যুক্তি’ বা ‘Argument from Design’ হিসেবে। শুধু জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তথা মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বর নামক ‘কারিগরের’ অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি হিসেবে অনেককাল ধরে প্যালের এই যুক্তিমালা ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঘড়ি যেমন নিজে থেকে সৃষ্ট হয়ে পথে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ঘড়ি তৈরীর পেছনে যেমন ঘড়ির কারিগরের ভূমিকা আছে, তেমনি মহাবিশ্ব তৈরীর পেছনেও ঈশ্বর জাতীয় কোন কারিগরের হাত থাকতেই হবে, এই ধারণাটি এক সময় সৃষ্টিবাদীদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্যালের যুক্তমালা নিয়ে আলোচনা এবং খন্ডন এই অধ্যায়ের পরিসরের বাইরে। উৎসাহী পাঠকেরা এর জন্য অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত অভিজিৎ রায়ের ‘আলোহাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ (২০০৫, ২০০৬) বইটি দেখতে পারেন।

পরিকল্পনাবিহীনভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে চোখের উৎপত্তির সম্ভাবনাকে এক্কেবারে উড়িয়ে দিয়ে প্যালে বলেছেন[১১] : 'মানবদেহে স্রেফ দৈবাৎ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ কোন ধরনের পরিকল্পনা (Design) বিহীন ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে হয়তো আঁচিল, আঁব, জরুল, তিল, ব্রণের মত জিনিসপত্র তৈরী হতে পারে কিন্তু কোনভাবেই চোখ নয়।' ... কোথাও কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

ডারউইন নিঃসন্দেহে প্যালের উক্তিগুলো পড়েছিলেন এবং এর একটি যোগ্য জবাবও মনে মনে ঠিক করেছিলেন যা তিনি দিয়েছিলেন পরে তার 'প্রজাতির উদ্ভব' বইয়ের মাধ্যমে। ডারউইন প্রস্তাব করলেন জীবদেহকে কেবল ঘড়ির মত যন্ত্রের মত কিছু ভেবে বসে থাকলে চলবে না। জীবজগৎ যন্ত্র নয়; কাজেই যন্ত্র হিসেবে চিন্তা করা বাদ দিতে পারলে এর পেছনে আর কোন কোন ডিজাইন বা পরিকল্পনাার মত 'উদ্দেশ্য' খোঁজার দরকার নেই। জীবজগতে চোখের উদ্ভব ও বিবর্তনের পেছনে ডারউইন প্রস্তাব করলেন এক 'অন্ধ কারিগরের', নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন- যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে চোখের মত অত্যন্ত জটিল অংগ-প্রত্যংগ গড়ে ওঠা সম্ভব। এ প্রক্রিয়াটির নাম ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (cumulative selection)। একাধিক ধাপের এই ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে যে ধাপে ধাপে যে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভুত হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত হয়েছে [১৩]। শুধু তাই নয়, এ পদ্ধতিতে আংশিকভাবে চোখের উৎপত্তি ও বিকাশ যে সম্ভব এবং তা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে যে একটি জীবের টিকে থাকার সম্ভাবনাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলতে পারে তারও অজস্র উদাহরণ রয়েছে আমাদের চারপাশে। ডারউইন তার 'প্রজাতির উৎপত্তি' (১৮৫৯) বইয়ে বলেন [১৪] :

> 'চোখের আছে কিছু অনুকরণীয় উপকরণ, যা দিয়ে এটি বিভিন্ন দূরত্বের সাথে ফোকাস করতে পারে, বিভিন্ন মাত্রার আলো এর ভিতরে ঢুকতে দিতে পারে, এবং গোলাকার ও বর্ণীয় অপেরণকে সংশোধন করতে পারে, সেটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভুত হয়েছে মনে করা হয়ত অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হতে পারে। তবুও যুক্তি আমাকে বলে যে, যদি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও সরল চোখ থেকে নিঁখুত ও জটিল চোখ পর্যন্ত অনেক কয়েকটি স্তর থেকে থাকে এবং প্রতিটি স্তর তার ধারকের জন্য উপকারী হয় বলে দেখানো যায়; আর যদি চোখগুলো সামান্য পরিমানেও পরিবর্তনশীল হয়, এবং বিভিন্নতাগুলো বংশানুসৃত হয় (যা অবশ্যই সম্ভব), আর যদি অঙ্গের বিভিন্নতাগুলো বা পরিবর্তনগুলো জীবনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে প্রাণীর জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হয়, তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নিখুঁত ও জটিল চোখের উদ্ভব যতই অবাস্তব শোনাক না কেন, না ঘটার কোন কারণ নেই।'

বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধাপে ধাপে ঘটে। আজকে আমরা চোখের যে পূর্ণাংগ গঠন দেখে মুগ্ধ হই তা একদিনে তৈরি হয়নি, তা বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা ছোট ছোট পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। ডারউইনের পরে গত দেড়শো বছরে আমরা চোখসহ বিভিন্ন অঙ্গের বিবর্তন সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পেরেছি। বিবর্তনের ইতিহাসে, খুব সম্ভবত, বেশ কয়েকবারই আলাদা আলাদাভাবে চোখের বিকাশ ঘটেছে- কখনও মাকড়সা, কাঁকড়া, বিভিন্ন পোকার মত সন্ধিবদ্ধ (arthropod) প্রানীদের মধ্যে, আবার কখনও অক্টোপাস, শামুক, ঝিনুক জাতীয় মলাস্ক (Mollusk) প্রাণীদের মধ্যে এবং কখনও বা আমাদের মত মেরুদন্ডী (Vertebrates) প্রাণীদের মধ্যে।

এই তিনটি গ্রুপের মধ্যেই আলাদা আলাদাভাবে চোখের সৃষ্টি এবং বিকাশ ঘটেছে - এই বিভিন্ন ধরনের চোখগুলো একেটা একেক রকম পদ্ধতিতে কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত এরা সবাই চোখের ভুমিকাই পালন করে। খুব সম্ভবত আলোর প্রতি সংবেদনশীল একধরনের স্নায়বিক কোষ থেকে প্রথম চোখের বিকাশ শুরু হয়। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আজকে তারা এই রূপ গ্রহন করেছে। কতগুলো সংবেদনশীল কোষকে কাপের মত অবতলে যদি ঠিকমতভাবে সাজানো যায় তাহলে যে নতুন একটি আদি-চোখের উদ্ভব হয় তার পক্ষে আলোর দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে উঠে।

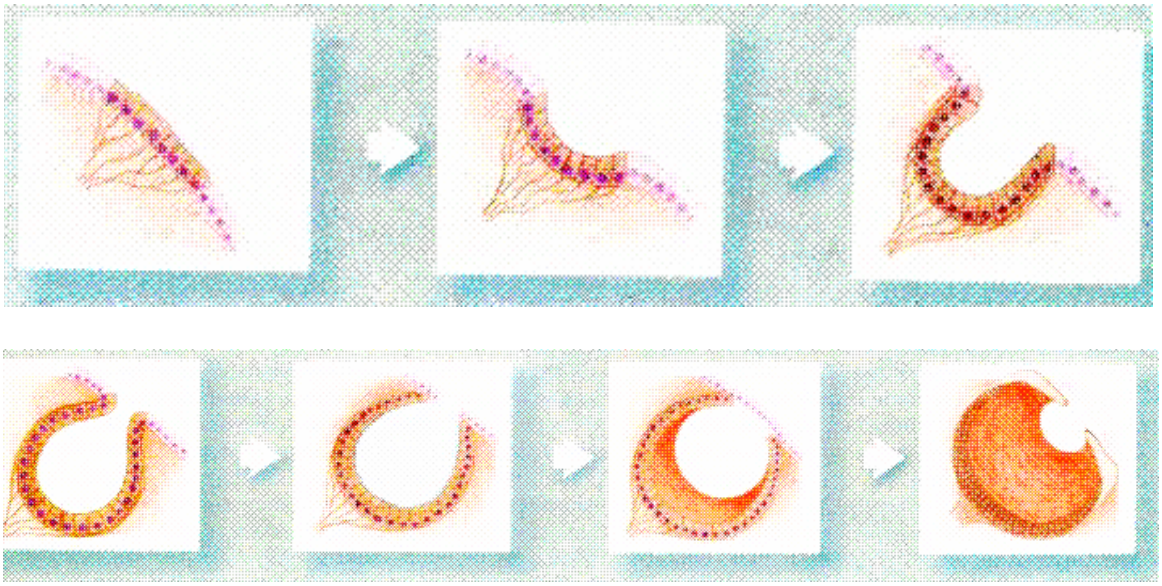

চিত্র ১০.১ : চোখের বিবর্তন : চোখের মত একটি জটিল প্রত্যঙ্গ সহজেই আলোর প্রতি সংবেদনশীল খুব সরল স্নায়বিক কোষ বিশিষ্ট 'আই-স্পট' থেকে বিভিন্ন ধাপে ধাপে পরিমিত ভিন্নতার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে পারে। যখনই এ ধরনের কোন পরিবর্তন - যা কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা প্রদান করে, তা ধীরে ধীরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জনপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।
(সৌজন্য : http://www.millerandlevine.com/km/evol/lgd/index.html)

এখন যদি এই কাপটির ধারগুলোকে কোনভাবে বন্ধ করা যায় তাহলে আধুনিক pin-hole camera-এর মত চোখের উৎপত্তি ঘটবে। তারপর একসময় গতি নির্ধারণ করতে পারে এমন একটি অক্ষিপট (Retina) বা রং বুঝতে পারে কোনের (cone) মত এমন একটি অংশ বিকাশ লাভ করে তাহলে আরও উন্নত একটি চোখের সৃষ্টি হবে। এরপর যদি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইরিস ডায়াফ্রামের (Iris diaphragm) উৎপত্তি ঘটে তাহলে চোখের ভিতরে কতখানি আলো ঢুকবে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এরপর আস্তে আস্তে যদি লেন্সের (lens) উদ্ভব ঘটে তা তাকে আলোর সমন্বয় এবং ফোকাস করতে সহযোগিতা করবে আর এর ফলে চোখের উপযোগীতা আরও বাড়বে। এইভাবেই সময়ের সাথে সাথে মিউটেশনের মাধ্যমে চোখের ক্রমান্বয়িক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা এখনও আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাই, অনেক আদিম প্রাণীর মধ্যে এখনও বিভিন্ন রকমের এবং স্তরের আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিছু এককোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা করতে পারে, আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই

আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলি একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরার মত মেরুদন্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে, এবং তা দিয়েই বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ক)

খ)

গ)

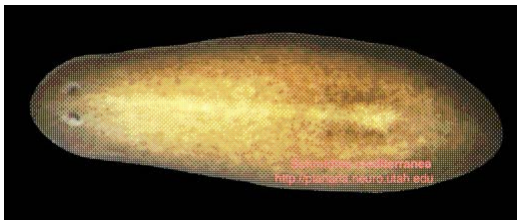

ঘ)

চ)

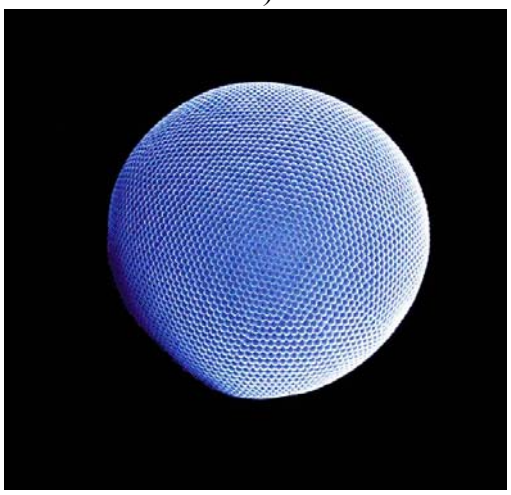

ঙ)

চিত্র ১০.২ : প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের চোখ : ক) অন্ধ গুহা মাছ মেক্সিকান টেট্রা (Astyanax mexicanus); (খ) অন্ধ cave salamander: খুব সূক্ষভাবে লক্ষ্য করলে চামড়ার নীচে 'আদিম প্রকৃতির' চোখের অবস্থান বোঝা যাবে; (গ) আদিম নটিলাসের পিন-হোল ক্যামেরা সদৃশ চোখ; (ঘ) প্লানারিয়াম : কাপ 'আইস্পট' (ঙ) অ্যান্টার্কটিক ক্রিল (চ) মানুষের চোখ।

বিবর্তনবাদ : এক ইউনিভার্সাল এসিড

পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক ধ্যন ধারণার কোন কমতি নেই, কিন্তু খুব কম বৈজ্ঞানিক ধারণাই জনসাধারণের মানসপটে স্থায়ীভাবে বিপ্লব ঘটাতে পেরেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক থমাস কুন (Thomas Kuhn) এ ধরনের যুগান্তকারী বিপ্লবাত্মক ধারণাকে 'প্যারাডিম শিফট্' (Paradigm Shift) নামে অভিহিত করতেন [১৫]। *প্যারাডিম শিফট্* কিন্তু হর-হামেশা ঘটে না। মানব সভ্যতার ইতিহাস তামা-তামা করে খুঁজলেও দু'একটির বেশি *প্যারাডিম শিফটের* উদাহরণ পাওয়া যাবে না। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব ছিল একটি *প্যারাডিম শিফট্*, যা আমাদের চিরচেনা বিশ্বব্রহ্মান্ডের ছবিটাই দিয়েছিল আমূল বদলে। ঠিক একই ভাবে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে *প্যারাডিম শিফটের* উদাহরণ হল বিবর্তনতত্ত্ব [১৬]। এই বিবর্তন তত্ত্বই আমাদের শিখিয়েছে যে, কোন প্রজাতিই চিরন্তন বা স্থির নয়, বরং আদিম এক কোষী প্রাণী থেকে শুরু করে এক প্রজাতি থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আরেক প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, আর মানুষ সহ পৃথিবীর সব প্রাণীই আসলে কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে। ডারউইন শুধু এ ধরনের একটি বিপ্লবাত্মক ধারণা প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হননি, বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি (প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে) কিভাবে কাজ করে তার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে [১৭], প্রথমবারের মত ১৮৫৯ সালে 'প্রজাতির উদ্ভব' বা 'অরিজিন অব স্পিশিজ' বইয়ে। খুব অবাক হতে হয় এই ভেবে, যে সময়টাতে সৃষ্টি রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে প্রায় সকল বিজ্ঞানী আর দার্শনিকই সবে ধন নীল-মনি ওই বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে মুখ থুবরে পড়ে ছিলেন আর বাইবেলীয় গণনায় ভেবে নিয়েছিলেন পৃথিবীর বয়স সর্বসাকুল্যে মাত্র ছ'হাজার বছর আর মানুষ হচ্ছে বিধাতার এক 'বিশেষ সৃষ্টি', সে সময়টাতে জন্ম নিয়েও ডারউইনের মাথা থেকে এমনি একটি যুগান্তকারী ধারণা বেরিয়ে এসেছিলো যা শুধু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকেই তরান্বিত করেনি, সেই সাথে চাবুক হেনেছিলো আমাদের ঘারে সিন্দাবাদের ভুতের মত সওয়ার হওয়া সমস্ত ধর্মীয় সংস্কারের বুকে। দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট এজন্যই বোধ হয় বলেছিলেন, 'আমাকে যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণাটির জন্য কাউকে পুরষ্কৃত করতে বলা হয়, আমি নিউটন, আইনস্টাইনদের কথা মনে রেখেও নির্দ্বিধায় ডারউইনকেই বেছে নেব।' [১৮] 'ডারউইনের বুলডগ' বলে কথিত বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি ডারউইনের 'প্রজাতির উদ্ভব' বইটিকে নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়ার' পর জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী 'মহাস্ত্র' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন; আবার সেই সাথে আবার দুঃখও করেছিলেন এই ভেবে - 'এতোই নির্বোধ আমি যে এত সহজ ব্যাপারটা আগে আমার মাথায় আসেনি।' [১৯] বিজ্ঞানী আর্নেস্ট মায়ার বলেছেন, 'ডারউইনিয়ীয় বিপ্লব যে মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণা - এটি যে কারো পক্ষে খন্ডন করা কঠিনই হবে।' [২০] স্টিফেন জে গুল্ড মনে করতেন তাবৎ পশ্চিমা বিশ্বের আধা ডজন বাছা বাছা তত্ত্বের মধ্যে ডারউইনের তত্ত্ব থাকবে শীর্ষস্থানে। [২১] আর অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স তো মনেই করেন যে, শুধু পৃথিবী নয় সমগ্র মহাবিশ্বে কোথাও প্রাণের বিকাশ ঘটলে তা হয়ত ডারউইনীয় পদ্ধতিতেই ঘটবে, কারণ ডারউইনীয় বিবর্তন সম্ভবতঃ একটি 'সার্বজনীন সত্য' (universal truth)।[২২] সমগ্র মহাবিশ্বের প্রেক্ষাপটে 'সার্বজনীন সত্য' কিনা তা এখনো প্রমাণিত না হলেও স্বীকার করে নিতেই হবে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব আর এর নান্দনিক বিকাশকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের চেয়ে ভাল কোন তত্ত্ব এ মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব যেমন একটি সফল তত্ত্ব, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের তত্ত্ব তেমনি একটি অত্যন্ত সার্থক তত্ত্ব।

দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট বিবর্তনতত্ত্বকে 'ইউনিভার্সাল এসিড' (universal acid) বা রাজাম্ল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন [৮]। ইউনিভার্সাল এসিড যেমন তার বিধ্বংসী ক্ষমতায় সকল পদার্থকে পুড়িয়ে-গলিয়ে ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমস্ত প্রথাগত ধর্মীয় ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারকে একেবারে দুর করে দিতে পারে। অধ্যাপক ডেনেট তার বিখ্যাত বইটিতে [৮] বিবর্তন তত্ত্বকে 'ডারউইনের বিপজ্জনক প্রস্তাব' (Darwin's dangerous idea) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি 'বিপজ্জনক' কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী কোন উপরওয়ালার নির্দেশনা ছাড়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল জীব থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভুত হতে পারে।

সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন

ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষ নাগাদ ব্রিটেনসহ সারা ইউরোপের শিক্ষিত মহলেই ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠে, বিজ্ঞানীদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি চার্চের পাদ্রীদের মধ্যেও [১৬]। কিন্তু ইউরোপের অবস্থা যতখানি না ভাল হতে থাকল, আমেরিকার অবস্থা হতে লাগলো পাল্লা দিয়ে ততটাই খারাপ। তার কারণ, সেখানে বিবর্তনের ব্যাপারটি শিক্ষাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তা কোনরকম সচেতনতা জাগাতে ব্যর্থ হয়। আর মানুষকে অসচেতন রাখতে পুরোমাত্রায় ইন্ধন যুগিয়ে চলে সেখানকার খ্রীষ্টিয় চার্চ এবং আমেরিকার রক্ষণশীল সরকারগুলো। ফলে দেখা গেল, জামানা পাল্টে গেলেও বেশিরভাগ আমেরিকানই বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকেই 'শিরোধার্য' করে বসে আছেন**। সারা দুনিয়া জুড়ে শিক্ষাঙ্গনে যে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে তার ছোঁয়া যেন আমেরিকানরা লাগাতেই চাইলেন না গায়ে। ধীরে ধীরে আমেরিকার প্রেস এবং মিডিয়ারও চোখেও বিবর্তন বনাম সৃষ্টিতত্ত্বের অলিখিত দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা নজরে পড়ল এবং তাদের দৌলতেই ১৮৯০ সালের পর থেকে এই বিতর্ককে 'জনগণের মধ্যে' ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হল। এখনও আমেরিকায় জনগণের মধ্যে বিবর্তন এবং সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কের কোন শেষ নেই। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, আমেরিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্মপ্রাণ দেশ (ভারতের পরই)। অথচ ইউরোপে কিন্তু পরিস্থিতি একদমই অন্যরকম, সেখানে ইউরোপের বেশীরভাগ মানুষই আজকে বিবর্তনবাদকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

একটি জিনিস এখানে পরিস্কার করা দরকার। আমেরিকার সাধারণ মানুষ বা রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যাই বিশ্বাস করুক না কেন আজকের দিনে জীববিজ্ঞানীদের সকলেই কিন্তু বিবর্তনবাদী। বিবর্তনবাদের স্বীকৃতি ছাড়া আজকে জীববিজ্ঞানের সব শাখাই অচল। কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালেই বিবর্তনের মুল বিষয়টির সমালোচনা বা বিরোধিতা করা হয় না; সেখানে হয়তো বিবর্তনটা কিভাবে ঘটছে তার পদ্ধতি নিয়ে (যেমন ধীর গতিতে ঘটছে নাকি উল্লম্ফন ঘটছে) মতানৈক্য হতে পারে, বিতর্ক হতে পারে বিবর্তনের পদ্ধতি কি ফাইলেটিক (phyletic), স্যালটেশন (saltation) নাকি কোয়ান্টাম (quantum) এ নিয়ে; কিন্তু বিবর্তন যে ঘটছেই সে ব্যাপারে জীববিজ্ঞানী এবং প্রাণরসায়নবিদদের মধ্যে এখন কোনো সংশয়ই নেই।

প্রায় অর্ধ শতকেরও বেশী হতে চললো শিক্ষায়তনে (academia) বিবর্তন নিয়ে কোন বিতর্ক নেই, যা বিতর্ক সবই ওই রাজনৈতিক মহলে, আইন-আদালতে, মিডিয়া, স্কুল বোর্ডে কিংবা ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফোরাম এবং ওয়েব সাইটে। বোঝা কষ্টকর নয় 'সীতার অগ্নিপরীক্ষার' মত ডারউইনীয় বিবর্তন তত্ত্বকে কেন বার বার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কেন টেনে হিঁচড়ে এমনকি আদালতের কাঠগড়াতেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বারবার; কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডারউইনবাদ অত্যন্ত সাফল্যের সাথেই বিপদকে সামাল দিতে পেরেছে। ইতিহাসের যে আইনী লড়াইগুলো বিগত শতাব্দীর আশির দশক পযর্ন্ত আমেরিকার জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে সেগুলো হল : টেনিসির

———————————————————

** 'দ্য ক্রিয়েশনিস্টস' (১৯৯২) বইয়ের লেখক রোনাল্ড নাম্বারসের মতে প্রথম দিকে সৃষ্টিবাদ (creationism) শব্দটি 'বিবর্তন-বিরোধী' সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত না; কারণ, বিবর্তন বিরোধীদের সে সময় কোন সৃষ্টির কোন বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঐকমত ছিল না। কিন্তু ১৯২০ সালের পর থেকে আমেরিকায় বাইবেলীয় সৃষ্টিতত্ত্ব বিবর্তন-বিরোধী মহলে বিবর্তনতত্ত্বের বিকল্প মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

স্কোপস 'মাঙ্কি' ট্রায়াল (Scopes Trial, 1925), আরকানসাসের ভারসাম্যমূলক বিচারের ধারা (Arkansas Balanced Treatment Act, 1981), লুইজিয়ানার সৃষ্টিবাদী ধারা (The Louisiana Creationism Act, 1987)[২৩]। এর মধ্যে স্কোপস ট্রায়ালের রায় বিবর্তনবাদীদের বিপক্ষে গেলেও এতে তাদের 'নৈতিক বিজয়' অর্জিত হয়, আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। লুজিয়ানার আইনী লড়াই তো একেবারে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। শেষপর্যন্ত আরকানসাস এবং লুজিয়ানা -দু জায়গার আদালতই তথাকথিত 'সৃষ্টিবিজ্ঞান' (Creation science)কে 'বিজ্ঞানের ছদ্মবেশধারী এক ধর্মীয় মতবাদ' (Religious dogma) হিসেবে আখ্যায়িত করে 'অসাংবিধানিক' হিসেবে বাতিল করে দেয়।

স্কোপস ট্রায়ালের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। ১৯২৫ সালে জীববিজ্ঞানের শিক্ষক জন স্কোপসকে টেনেসীর ডেটন থেকে গ্রেফতার করা হয় স্কুলের ছাত্রদের 'বিবর্তন পড়ানোর অজুহাতে'। আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যাপারটা শুনতে খুব অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু সেসময় সেটাই ছিল রূঢ় বাস্তবতা। মুলতঃ ১৮৯৫ সালে নাইজেরিয়ায় বাইবেল বিশ্বাসীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যাকে 'নাইজেরিয়া বাইবেল কনফারেন্স' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকেই আমেরিকার 'মৌলবাদীরা' (fundamentalists) বিভিন্ন প্রদেশে 'বিবর্তন-বিরোধী আইন' বলবৎ করার জন্য সরকারের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে। সৃষ্টিবাদীদের দৌরাত্ম সেসময় এতোই বেশি ছিল যে টেনিসি, মিসিসিপি এবং আরকানসাসের মত প্রদেশগুলোতে স্কুল কলেজে বিবর্তন পড়ানোই ছিল অপরাধ। ওকলাহামার পাঠ্যপুস্তক থেকে বিবর্তন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর ফ্লোরিডায় ডারউইনবাদকে 'ধ্বংসাত্মক' হিসেবে চিহ্নিত করে হেয় করা হয়েছিল[২৪]। এমন এক পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি করবার লক্ষ্যে জন টি স্কোপস নামের টেনিসির এক হাইস্কুল শিক্ষক ছাত্রদের বিবর্তন পড়িয়ে সেখানকার বিবর্তন-বিরোধী আইনের বলি হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যথারীতি স্কোপসকে গ্রেফতার করা হল এবং আদালতের হাতে সোপর্দ করা হল। স্কোপসের পক্ষে লড়েছিলেন বিখ্যাত আইনবিদ ক্লেরেন্স ড্যারো (Clarence Darrow)। আর উল্টো পক্ষে ছিলেন তিন তিনবার (ব্যর্থ) প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এবং তার্কিক উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান (Willium Jennings Bryan)। দুর্ভাগ্যক্রমে আদালত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সাক্ষ্য গ্রহণে অপারগতা দেখায়, যা চার্লস ড্যারোকে হতাশ করে দেয়। তারপরও চার্লস ড্যারোর জেরায় জর্জরিত হয়ে ব্রায়ান জেনিংস একটা সময় স্বীকার করতে বাধ্য হন যে পৃথিবীর বয়স বাইবেল বর্ণিত ৬০০০ বছরের ঢের বেশি [২৩]। পুরো কোর্ট পরিণত হয় যেন এক জলজ্যান্ত সার্কাসে।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত স্কোপসকে বিবর্তন পড়িয়ে টেনেসির আইন ভাঙার অপরাধে (যা তিনি সত্যই করেছিলেন) একশ ডলার জরিমানা করা হয়। পরবর্তীতে অবশ্য স্কোপস আপিল করায় সে দন্ডও মওকুফ হয়ে যায়। কিন্তু এখানে পুরো ব্যাপারটিতে আসলে বিবর্তনবাদীদের নৈতিক বিজয় ঘটে। টেনিসির আদালত সারা আমেরিকাতেই এক ঠাট্টা তামাসার পাত্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এইচ এল মেনকেন (H.L. Mencken) নামের এক পত্রিকার রিপোর্টার তার ক্ষুরধার লেখনীতে মৌলবাদী সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের একেবারে তুলোধুনো করে ছাড়েন। দীর্ঘদিন ধরে মামলা মোকদ্দমার চাপ আর দেশ জুড়ে ঠাট্টা তামাসা সহ্য করতে না পেরে রায় প্রদানের দিন কয়েকের মধ্যেই ব্রায়ান জেনিংসের অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৯৬০ সালে স্কোপস ট্রায়ালকে ভিত্তি করে স্ট্যানলি ক্রামারের (Stanley Kramer) নির্দেশনায় একটি বিখ্যাত চলচিত্র নির্মিত হয় -'Inherit the wind'। সেটিতে ড্যারোর ভূমিকায় আভিনয় করেন বিখ্যাত অভিনেতা

স্পেনসার ট্রেসি (Spencer Tracy), ব্রায়ান জেনিংসের ভূমিকায় ছিলেন ফ্রেডরিক মার্চ (Fredric March), আর মেনকেনের ভুমিকায় ছিলেন জীন কেলি (Gene Kelley)। ছবিটি সে সময় দর্শকদের মধ্যে দারুন জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত তা ইতিহাসের অন্যতম 'ক্লাসিক' ছবি হিসেবে বিবেচিত।

সৃষ্টিবাদীরা স্কোপস ট্রায়ালের পর থেকে নতুন উদ্যমে এবং নতুন ধারায় নিজেদের মতবাদ প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে। বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কোন কিছুই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে মিলছে না দেখে, ১৯৬১ সালে জন হুইটকম্ব (John Whitcomb) এবং হেনরী মরিস (Henry Moris) 'The Genesis Flood' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। লেখকেরা দাবী করেন যে সাদা চোখে যতই বেমানান লাগুক না কেন, বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্ব আসলে বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক মহলে বইটি কোন গ্রহনযোগ্যতা না পেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা এই বইটির মধ্যে ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকে ঠেকানোর অভিনব কিছু পন্থা খুঁজে পায়। ১৯৬৩ সালে হেনরী মরিস Creation Research Society (CRS) এবং সত্তর দশকের দিকে 'Institute of Creation Research' (ICR) প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল স্কুল কলেজগুলোতে এ নতুন সৃষ্টিতত্ত্বকে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' পড়ানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করা। মরিস এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা পরিস্কার করেই বলেন [২৪] :

> 'আমরা যে চেষ্টাকে মহিমান্বিত করি তা হল প্রথমে এটি বোঝা যে ঈশ্বরের বাণী হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী; এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় ঈশ্বর পরিস্কার করেই বলতে সক্ষম, এবং যা বলেন তা সঠিকভাবেই নির্দেশ করেন। বাইবেলে ঠিক তাই রয়েছে, যা আমাদের মূলমন্ত্র। এটা আমরা মেনে নেই, আর তারপর বৈজ্ঞানিক উপাত্তগুলোকে সেই (বাইবেলীয়) কাঠামোর ভিতরে ফেলে ব্যাখ্যা করি।'

ICR এর ওয়েব সাইটেও লেখা আছে [২৫] :

> 'The Bible is the written word of God … To the student of nature this means that the account of origins in Genesis is a factual presentation of simple historical truth.'

এ ধরনের 'রিসার্চ' কতটা 'বৈজ্ঞানিক' তা নিয়ে সব সময়ই সংশয় তো থেকেছেই, তা হাসির ও খোরাক হয়েছে পুরোমাত্রায়। গবেষণা করার সময় বিজ্ঞানীরা খোলা মনে 'রিসার্চ করবেন' এটাই ধরে নেওয়া হয়। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন নিরপেক্ষভাবে করা পরীক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে। কিন্তু বাইবেল বিশ্বাসী 'বিজ্ঞানীরা' তা করেন না। তারা বাইবেল যে 'অভ্রান্ত' সে সিদ্ধান্তেই সব সময় অটল থাকেন। আর আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের আলোকে বাইবেলকে 'পুনর্ব্যাখ্যা' করেন। যখন 'পুনর্ব্যাখ্যা' করতে পারেন না, কিংবা ধর্মগ্রন্থের সাথে তাদের সৃষ্টির গল্পগুলোর এতটাই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তখন তারা খোদ বিজ্ঞানের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকেন। নীচের কার্টুনটি দেখলেই বোঝা যাবে সৃষ্টিবাদীদের বিজ্ঞান 'Creation Sceince' কিভাবে কাজ করে। বলা বাহুল্য, কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালে কখনই এই 'সৃষ্টি-বিজ্ঞানী'দের কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। ডঃ ইউজিন স্কট (Eugenie Scott) এবং ডঃ হেনরী কোল (Henry Cole) একবার একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছিলেন যে, এই সৃষ্টিবিজ্ঞানীরা আটষট্টিটি জার্নালে তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল পাঠাতে পারতেন, কিন্তু নিজেরাই বুঝেছিলেন যে

সেগুলো এতই নিম্নমানের যে পাঠানোর উপযুক্ত নয়, কিংবা যদিও বা কিছু পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গত কারণেই সেগুলো প্রত্যাখ্যাতও হয়েছিলো [২৬]।

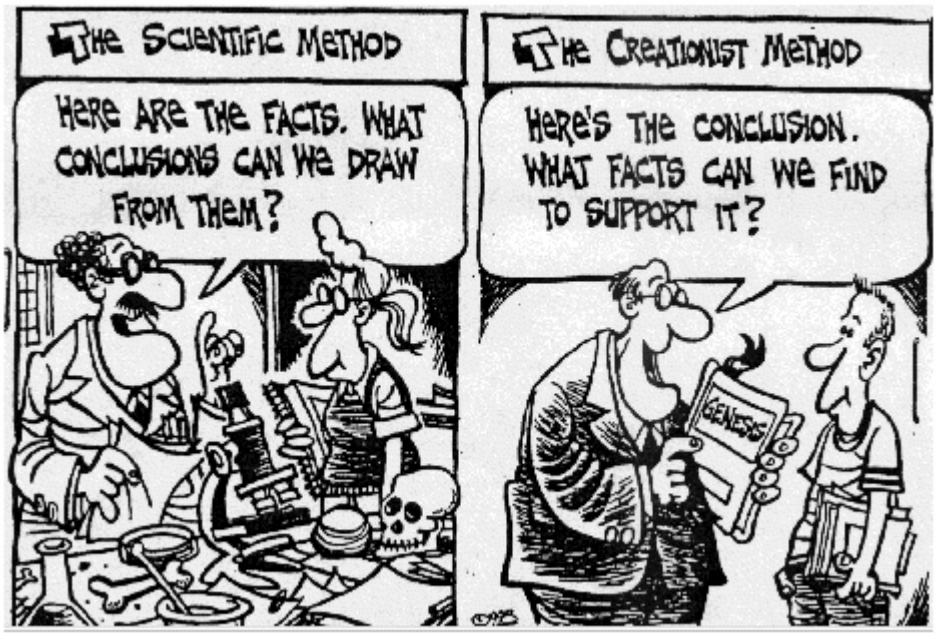

চিত্র ১০.৩ : কার্টুন : প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বনাম সৃষ্টি বিজ্ঞানের পদ্ধতি

মরিসের পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বের আরেক মহারথি ছিলেন দুয়েন গিশ (Duane Gish)। বায়োকেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট করা এ ভদ্রলোক, অত্যন্ত দক্ষ তার্কিক। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে এ ভদ্রলোক সারা আমেরিকার উপকূল জুড়ে ভ্রমণ করতেন আর বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীদের সাথে মুখোমুখি বিতর্কে লিপ্ত হতেন। জীববিজ্ঞানীদের অধিকাংশই যেহেতু ল্যাব-রিসার্চ নিয়েই পড়ে থাকতেন, তাদের অনেকেই বাকপটু ছিলেন না, অনেকে প্রকাশ্য বিতর্কে অভ্যস্তও ছিলেন না। গিশ বেছে বেছে এ ধরনের জীববিজ্ঞানীদের নিজের সহজ শিকারে পরিণত করতেন। আর সাধারণ মানুষদের যেহেতু বিবর্তনের জটিল টেকনিকাল বিষয়গুলো নিয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, সুযোগটি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতেন গিশ। প্রকাশ্য সভায় বিভিন্ন চটকদার বক্তব্য আউড়ে তিনি প্রতিপক্ষ জীববিজ্ঞানীদের ধরাশায়ী করার ভঙ্গী করে দর্শকদের 'বাহবা' কুড়াতেন। আর দর্শক সারির একটা বড় অংশই ছিল আবার চার্চগামী খ্রীষ্টান। তারা গিশের প্রতিটি বিতর্ক সভায় দলবল নিয়ে যোগদান করতেন আর গিশের প্রতিটি কথার পরই হাত তালির বন্যা বইয়ে দিতেন। ফলে প্রথম থেকেই তারা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন যে, বিতর্ক শুরুর আগেই মনে হত গিশ বুঝি জয়ী হয়ে গিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে এ সমস্ত চমকবাজীর প্রভাব আমেরিকায় পড়েছিল। অচিরেই রক্ষণশীলদের চাপে আর্কানসাস এবং লুজিয়ানায় বিবর্তনের পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বকেও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'ভারসাম্যমুলক' আইন প্রবর্তন করা হল। এই আইনকে 'অসাংবিধানিক' হিসেবে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করলেন আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (ACLU)। ফলে বিবর্তন-সৃষ্টিতত্ত্বের 'দ্বন্দ্ব' আবারও আদালতের কাঠগড়ায় উঠে এল। এবার আর্কানসাসের আদালত পরিণত হল 'সৃষ্টি বিজ্ঞানী'দের তামাসায়। সেখানে

একেক 'সৃষ্টি বিজ্ঞানী' একেক ভাবে নিজেদের বিশ্বাস উপস্থাপন করতে থাকেন, যুক্তি এবং বুদ্ধির লেশ ছাড়াই। যেমন, ডালাসের ধর্মতাত্ত্বিক নর্মান গেইসলার (Norman Geisler) ঘোষনা করলেন - 'ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেও ঈশ্বর যে আছে তাতে নিজের বিশ্বাস আনা সম্ভব।' তিনি আরো বললেন, আকাশে দেখা ইউএফও বা উড়ন্ত চাকীগুলো নাকি শয়তানের চর! আরেক মৌলবাদী সৃষ্টিতাত্ত্বিক ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হেনরী ভস (Henry Voss) কে তো ফিরিয়েই নেওয়া হল কারণ তিনি বিচার শুরুর ঠিক আগে শয়তানের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন।

সৃষ্টি-বিজ্ঞানীদের অনেকেই আদালতে স্বীকার করলেন যে তারা গবেষণার নামে যা করছেন তা আসলে বিজ্ঞান নয়। লোমা লিন্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারল্ড কফিন (Harold Coffin) বললেন, 'না, সৃষ্টি-বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষণযোগ্য নয়।' লোমা লিন্ডার আরেক 'বিজ্ঞানী' এরিয়েল রথ(Ariel Roth)কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল সৃষ্টিবিজ্ঞান আসলেই বিজ্ঞান কিনা তিনি বললেন - 'যদি আপনি বিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেন পরীক্ষণযোগ্যতা আর পূর্বাভাসযোগ্যতার নিরিখে, তবে আমার উত্তর, না!'। হ্যারল্ড কফিন (Harold Coffin) ক্যাম্বরিয়ান বিস্ফোরন, মধ্যবর্তী ফসিলের অভাব ইত্যাদি নানা অভিযোগে বিবর্তনকে অভিযুক্ত করলেন। কিন্তু কোঁসুলীর জেরার সামনে আসল গোমড় ফাঁস হয়ে গেল।

জেরার নমুনা :

> প্রঃ ১৯৫৫ সালে আপনার পি এইচ ডি-র পর তো কেবলমাত্র দুটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে স্ট্যান্ডার্ড সায়েন্টিফিক জার্নালে, না?
>
> উঃ হ্যাঁ, ঠিক।
>
> প্রঃ বলা হয় যে ক্যানাডার বার্জেস শেল (Burgess shale) তো ৫০০ মিলিয়ন বছরের বেশী পুরোন, কিন্তু আপনার তো ধারণা এটির বয়স মাত্র ৫০০০ বছর, তাই না?
>
> উঃ হ্যাঁ।
>
> প্রঃ বাইবেল না থাকলে তো পৃথিবী যে মিলিয়ন বছরের পুরোন তা মানতে আপনার কোন অসুবিধা ছিল না, তাই না?
>
> উঃ হ্যাঁ, যদি বাইবেল না থাকত।

দেখা গেল যে পাঁচজন বিজ্ঞানীকে সৃষ্টি-বিজ্ঞান সমর্থন করার জন্য আদালতে আনা হয়েছে তারা সবাই Creation Research Society (CRS)-এর সদস্য। তারা সকলেই একটি শপথনামায় সাক্ষর করেছিলেন এই মর্মে যে তারা বাইবেলের বাণীকে আক্ষরিক (literal interpretation) অর্থেই গ্রহণ করেন। CRS এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্গারেট হেলডার (Margatet Helder) আদালতে স্বীকার করলেন যে বিশেষ সৃষ্টিবাদের (special creation) পক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

ফেডারেল জজ উইলিয়াম ওভার্টনের সামনে আরকানসাসের ভারসাম্যমূলক বিচারের ধারাকে

'অসাংবিধানিক' হিসেবে ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকলো না। তিনি ১৯৮২ সালের ৫ই জানুয়ারী বিচারের রায়ে ঘোষণা করলেন এই তথাকথিত 'সৃষ্টি বিজ্ঞান' আসলে 'সৃষ্টির বাইবেলীয় ভাষ্যকে সরকারী স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার সুচতুর প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।' এ ধরনের প্রচেষ্টা আমেরিকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনীকে লংঘন করে।

একইভাবে ১৯৮৫ সালে লুইজিয়ানাতেও ফেডারেল জজ অ্যাড্রিয়ান ডুপ্লান্টিয়ার (Adrian Duplantier) 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে তথাকথিত সৃষ্টিবিজ্ঞানকে বাতিল করে দেন। পরবর্তীতে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালের রায়ে সৃষ্টিতত্ত্বকে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে 'ধর্মীয় প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর' অভিযোগে অভিযুক্ত করে স্কুল কলেজে এর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয় [২৪]।

ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন : 'আধুনিক সৃষ্টিবাদ' এর জন্ম

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে ক্রিয়েশন সায়েন্সকে 'বৈজ্ঞানিক নয়' বরং 'রিলিজিয়াস ডগমা' হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়ার পর পরই সৃষ্টিবাদীরাও বুঝে গিয়েছিলেন যে এভাবে আর সচেতন জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। তারা যখন দেখলো যে বিজ্ঞানীমহল কিছুতেই তাদের অবৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলোকে সমর্থন করছে না তখন তারা সত্যিকার অর্থেই মরিয়া হয়ে উঠল। গোপনে গোপনে জন্ম হল 'আধুনিক সৃষ্টিবাদের'। এই 'আধুনিক সৃষ্টিবাদী'রা তাদের পুর্বসূরীদের ভুল থেকে মূলতঃ তিনটি শিক্ষা নিলেনঃ

> প্রথমতঃ তারা বুঝেছিলেন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশ্বাসকে (sectarian belief) বিজ্ঞান হিসেবে চালানো যাবে না, বরং সার্বজনীন সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' হাজির করতে হবে।
>
> দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিতত্ত্বের যে সমস্ত পূর্বতন দাবীগুলো হাস্যকর শোনায় এবং বৈজ্ঞানিক মহলে এবং সচেতন জনগণের মধ্যে ইতোমধ্যেই পরিত্যক্ত হয়েছে (যেমন বাইবেল কথিত পৃথিবীর বয়স- ছ'হাজার বছর) সেগুলো বাদ দিয়ে আধুনিক এবং বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি হাজির করা।
>
> তৃতীয়তঃ বিজ্ঞান যে কেবল 'প্রাকৃতিক নিয়ম দিকে জগৎকে ব্যাখ্যা করে' -এই মনোভাবকে 'গোঁড়ামীপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করে অপার্থিব অলৌকিক সত্ত্বাকে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসা।

মোদ্দা কথা হল বিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য তাদের মূলতঃ দু'টো নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলো: একদিকে তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়লো আরেকটু 'সফিসটিকেটেড' তত্ত্বের আর অন্যদিকে অর্থ প্রতিপত্তি এবং রাজনৈতিক চালের জোড়ে সরকারী মাধ্যমগুলোতে আইডির পক্ষে সমর্থন জোগাড় করা। অর্থাৎ, সোজা পথে যদি স্কুল কলেজে তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব ঢোকানো না যায় তাহলে বাঁকা পথে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি, বিশেষতঃ যখন ক্ষমতা এবং অর্থ কোনটারই তাদের অভাব নেই। আর তারই

ফলাফল হচ্ছে আজকের এই সৃষ্টির 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' (Intelligent Design argument), বা সংক্ষেপে আইডি।

তত্ত্ব হিসেবে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'কে সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করা হয় বিগত নব্বই এর দশকে। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, ফিলিপ জনসন, জোনাথন ওয়েলস প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা এবং প্রচারক। প্রবক্তাদের সকলেই মোটা অঙ্কের অর্থপুষ্ট রক্ষণশীল খ্রীষ্টান সংগঠন *ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের* (Discovery Institute) সাথে যুক্ত। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং সর্বোপরি জৈব জীবন এতই জটিল এবং অনন্যসাধারণ যে প্রাকৃতিক উপায়ে সেগুলো উদ্ভুত হতে পারে না, এবং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনার ছাপ আছে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বর জড়িত থাকবার ব্যাপারটা মুখ ফুটে সরাসরি না বললেও সেদিকেই প্রায়শঃ ইঙ্গিত করে বলেন, বৈজ্ঞানিক ডেটাগুলো শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিংবা উচিৎ ও নয়, এগুলোকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে তখনই, যখন এক সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বার (intelligent agent) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে এগুলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে। প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক মহলে সুবিধা করতে না পারলেও বিজ্ঞান বিষয়ে অসচেতন রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিমন্ডলে এই 'আধুনিক সৃষ্টিবাদী'রা আক্ষরিক অর্থেই তর্ক-বিতর্কের টাইফুন ছুটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। আর বরাবরের মত তো আমেরিকান সরকার আর মৌলবাদী খ্রীষ্টান চার্চ পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ার জন্য তো মুখিয়ে ছিলই। যেমন, ভিয়েনার রোমান ক্যাথলিক আর্চ বিশপ Christoph Schonborn 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এর ৭ ই জুলাই, ২০০৫ সংখ্যায় পরিস্কার ঘোষণা করেন যে ক্যাথলিক চার্চ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনকে অস্বীকার করে। এর একমাস পরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ একটি প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে, তিনি স্কুল কলেজে বিবর্তন এবং 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' দুটোই পড়ানোর পক্ষে [২৭]।

তারা তাদের কৌশলের অংশ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ জনগণের কাছে গিয়ে দাবী করে যে এই 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্বের সাথে আসলে ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ ভাবেই একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। যেমন, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা এবং *ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের* অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম ডেম্বস্কি তার 'The Design Revolution' (২০০৪) বইয়ে বলেন [২৮] :

> 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি কোন প্রোটেস্ট্যান্ট- খ্রীষ্টান সংক্রান্ত বিষয় না, এমনকি সাধারণ খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের ব্যাপারও নয় .... এটি এক অগ্রসর বৈজ্ঞানিক গবেষনামূলক কর্মসূচী। এ অনুকল্পের প্রবক্তারা এটার উৎকর্ষতা এবং ন্যায্যতা কোন ধরনের ধর্মীয় আবেদন হাজির না করেই বৈজ্ঞানিক মহলে উত্থাপন করতে সচেষ্ট।'

সেই ডেম্বস্কিই আবার খ্রীষ্টানদের সভাসমিতিতে গিয়ে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে বলেন, তার লক্ষ্যই হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টকে বিজ্ঞানের জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি তার 'Intelligent Design: The Bridge Between Science and Theology' (১৯৯৯) বইয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই লিখেছিলেন [২৮] :

> 'বিজ্ঞানের যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি যীশু খ্রীষ্টকে দৃশ্যপট থেকে বিতারিত করে দিয়েছে সেগুলোকে মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে দেখতে হবে। যীশুকে বাদ দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর গভীর ধারণা লাভ করা যায় না।'

অর্থাৎ, আইডির প্রবক্তারা ঠিক করেছেন তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে 'রথও দেখবেন' আবার 'কলাও বেঁচবেন'। জনগণের সেক্যুলার অংশকে হাত করার লক্ষ্যে তারা ক্রমাগত প্রচার চালান যে তাদের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক, এর সাথে ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই, কিন্তু তাদের আসল গোমড় ফাঁস হয়ে যায় যখন তারা রক্ষণশীল মৌলবাদী সংগঠনের লোকজনের সাথে মিশতে গিয়ে বিশ্বাসের ঝাঁপি উপুর করে দেন!

ডিস্কোভারি ইন্সটিউটের আরেক কর্ণধর জোনাথন ওয়েলস 'Unification Church' এর আজীবন সদস্য। তিনি 'Moonie in-house journal' এ 'Darwinism : Why I went for a second PhD' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে পরিস্কার করেই বলেন তার জীবনের একমাত্র ব্রতই হচ্ছে ডারউইনিজম ঠেকানো। তিনি লিখেছেন [২৯] :

> 'পিতার (চার্চের ফাদার Reverend Moon) উপদেশ, আমার শিক্ষা আর প্রার্থনা আমাকে এই মর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে যে আমি আমার পুরো জীবন ডারউইনিজম ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত করব, ঠিক যেমনিভাবে Unification Church এর অনেক সদস্য মার্ক্সিজম ধ্বংস করার কাজে উৎসর্গ করেছেন। যখন পিতা ১৯৭৮ সালে পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আমাকে (আরো একডজন সেমিনারী গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সাথে) নির্বাচন করলেন, আমি সাথে সাথে এই সম্মুখ সমরে যোগদান করার সুযোগ লুফে নিলাম।'

বিজ্ঞান পড়লেই যে মানুষ 'বিজ্ঞানমনস্ক' হয় না জোনাথন ওয়েলসের উপরোক্ত উক্তিতেও তা আবারো প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স এ প্রসঙ্গে বলেন, 'This quotation alone casts doubt on any claims Wells might have had to be taken seriously as a disinterested seeker after truth-which would seem a fairly minimal qualification for PhD in science'। [৩০]
এই আধুনিক সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের দুরভিসন্ধি জনসমক্ষে আরো একবার প্রকাশিত হয়ে যায় যখন হঠাৎ করেই ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের এক 'গোপন দলিল' ১৯৯৯ সালে ইন্টারনেটে ফাঁস হয়ে যায়। দলিলটি 'ওয়েজ ডকুমেন্ট' (wedge document) নামে কুখ্যাত। দলিলটি http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/2437/wedge.html সাইটে এখনও রাখা আছে। দলিলটির ফাঁস হয়ে যাবার ব্যাপারটি এবং এর নির্ভরযোগ্যতা ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউট নিজেই স্বীকার করেছিল [২৮]। দলিলটিতে লেখা আছে, 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'- এর পুরোধাদের প্রধানতম লক্ষ্যই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদকে শিক্ষা, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অঙ্গন থেকে হটিয়ে দিয়ে সব জায়গায় ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করা আর যে প্রাকৃতিক এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের সৌধ গড়ে উঠেছে তার মূলে কুঠারাঘাত করা। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, দলিলটিতে আরও বলা হয়েছে, তাদের মূল আক্রোশটা হচ্ছে বস্তুবাদের পুরোধা ডারউইন, মার্ক্স এবং ফ্রয়েডের উপর। তারা বিজ্ঞানের বিরোধীতা করতে যেয়ে এতই অন্ধ হয় গেছেন যে, ডারউইন, মার্ক্স এবং ফ্রয়েড সবার দর্শনকে একাকার করে ফেলেছেন, তাদের পার্থক্যগুলো বোঝারও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। সে যাই হোক, আজকে অনেক আগ্রসর ধার্মিক এবং সৃষ্টিবাদী ব্যক্তিই বিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন এই বলে যে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সাথে এর কোন দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু ফিলিপ জনসনসহ আইডি প্রবক্তারা এতটাই অন্ধ মৌলবাদী যে তাদের ধার্মিক বিবর্তনবাদীদের (যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, এবং বিবর্তনবাদকেও একটি বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন) প্রতিও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই [২৪]।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন প্রবক্তরা পূর্বতন সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে তাদের পার্থক্য করতে চাইলেও প্রতিবারই তাদের প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেছে। এমনকি ডোভার কোর্টের মামলায় এটিও প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, Of Pandas and People নামের যে বইটি তারা ডোভার স্কুলের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন সেটির মূল লেখক Dean Kenyon এর কিছুদিন আগেই What is Creation Science? নামে একটি বইয়ের ভুমিকা লিখেছিলেন। বইয়ের দ্বিতীয় লেখক Percival Davis আবার বাইবেলীয় ছয় হাজার বছরের 'ইয়ং আর্থ' সমর্থন করে একটি বই লিখেছিলেন যার নাম - A Case for Creationism। তবে সবচেয়ে লজ্জাকর যে ব্যাপারটি প্রকাশিত হয়ে যায় তা হল, Of Pandas and People বইটি নিজেই একটি সৃষ্টিতাত্ত্বিক বই, যেটি ১৯৮৩ সালে 'Creation Biology' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে একই বই বেরোয় 'Biology and Creation' নামে। Of Pandas and People বইটি আসলে 'Biology and Creation' এরই হুবহু কপি শুধু 'creation' শব্দটি সরিয়ে দিয়ে 'Intelligent design' শব্দটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর 'Creator' এর জায়গায় 'Designer' বসানো হয়েছে।

নিঃসন্দেহে সচেতন মহলের কাছে আইডি প্রবক্তাদের এহেন 'লুকোচুরি খেলা' একদমই গ্রহনযোগ্যতা পায় নি। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের প্রবক্তারা তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে চালাতে চাইলেও বৈজ্ঞানিক মহলে এটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে; শুধু তাই নয়, এটিকে 'উত্তম মোড়কে সৃষ্টিবাদ' (better-packaged creationism), 'সস্তা জ্যাকেটে সৃষ্টিবাদ' (creationism in a cheap tuxedo), লুকানো সৃষ্টিবাদ (stealth creationism) ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় অভিষিক্ত করা হয় [৩১]।

আজকে আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে জীববিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানের এবং নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন। বেশীর ভাগ জায়গায়ই আইডি সমর্থকদের পরাজয় ঘটলেও ছোট খাটো কিছু জায়গায় তারা দিব্যি ঢুকে পড়তে পেরেছে, ওহাইও এবং কানসাসের দু'টি ছোট স্কুল বোর্ড (যেখানে রক্ষনশীল রিপাবলিকান দলের সদস্য সংখ্যা বেশী) ইতোমধ্যেই তাদের জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসুচীতে বিবর্তনবাদে সংশয় প্রকাশ করা উচিত বলে লাইন যোগ করে দিয়েছে। জর্জিয়ায় কব কাউন্টি স্কুল বোর্ড বিবর্তন একটি তত্ত্ব হলেও তা সত্য নয় বলে বইতে স্টিকার লাগিয়ে দেয়, পরে অবশ্য তারা তা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। জীববিজ্ঞানী ডঃ টিম বেড়া তার (Evolution and the Myth of Creationsim: a basic guide to the facts in the Evolution Debate) বইয়ের ভুমিকাতে লিখেছেন যে এতদিন বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের এইসব কর্মকান্ডকে অবহেলা করে এসেছে, শুধু গবেষণার কাজ করাকেই কর্তব্য মনে করেছে। কিন্তু আজকে আমেরিকায় এরা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, এরা মানব সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছে, বিজ্ঞানীদের জন্য আর চুপ করে বসে থাকা ঠিক হবে না। তাই আজকে আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বড় বড় জীববিজ্ঞানীরা যেখানেই আইডি নিয়ে মামলা হচ্ছে সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন সাক্ষ্য দিতে, মিডিয়ার বক্তব্য রাখছেন, বিজ্ঞান বিশেষতঃ বিবর্তনবাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বই লিখছেন, ইন্টারনেটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটগুলোতে বিস্তারিত লিখছেন এবং বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইনের দেওয়া 'যুক্তি'গুলো

'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের দুটি ভাষ্য পাওয়া যায়। একটি ভাষ্য পাওয়া যায়

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, যেটি বলে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মান্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) সাহায্যে তৈরী হয়েছে যে এর একচুল হের ফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনই প্রাণ সৃষ্টি হত না। অর্থাৎ, পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই ইচ্ছাটি মাথায় রেখে ঈশ্বর (কিংবা হয়ত অন্য কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বা) বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করেছিলেন, আর সে জন্যই আমাদের মহাবিশ্বঠিক এরকম; এত নিখুঁত, এত সুসংবদ্ধ।

আর ওদিকে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'এর জীববিজ্ঞানের ভাষ্যটি বলছে ঠিক তার উলটো কথা। জীববিজ্ঞানের আইডি প্রবক্তা 'ফাইন টিউনার'রা যে ভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা দেন ঠিক উলটো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের আইডির প্রবক্তারা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **অনুপযুক্ত** যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের আইডি ওয়ালারা উলটো ভাবে বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **উপযুক্ত** যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। একসাথে দুই বিপরীতধর্মী কথা তো সত্য হতে পারে না। বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের এই দুটি ভাষ্য নিয়েই তাহলে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করা যাক।

আমরা জীববিজ্ঞানের 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'গুলোই বিবেচনায় আনব আগে। কারণ, দুনিয়া জুড়ে এদের প্রাবল্য আর জোয়ারই বেশী। তারাই ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকে পাঠ্যপুস্তক থেকে হটিয়ে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'কে তার স্থলাভিষিক্ত করতে চান। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট বলেন [২৭] :

> 'সৌভাগ্যক্রমে অযথা কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করার জন্য আজকের দিনে পদার্থবিদদের খুব বেশী প্রণোদনা নেই। কারণ পদার্থবিদদের আর সাধারণ মানুষদের কাছে গিয়ে গিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝানোর চেষ্টা করে সময় নষ্ট করতে হয় না কারণ ওগুলো ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক মহলে এবং তার বাইরে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।
>
> কিন্তু বিবর্তনের ব্যাপারটা আলাদা। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের মৌলিক ধারণাটি শুধু মাত্র চিন্তার উদ্রেগকারকই নয়, এটি অত্যন্ত শক্তিশালী 'ডিজাইন আর্গুমেন্ট'কে বাতিল করে দেয়, যেটি দীর্ঘদিন ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রধানতম যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত। সে জন্যই যত প্রণোদনা আজও দেখা যায় তার প্রায় সবই জীববিজ্ঞানীদের ঠেকানোর ক্ষেত্রে।'

আইডির জীববিজ্ঞানীরা সেই পুরোন চোখকে আবারো তাদের তত্ত্বের এক প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। আসলে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন'-এর ব্যানারে, প্যালের সেই সৃষ্টতত্ত্বের যুক্তিই যে বিগত কয়েক দশকে আবার নতুন মোড়কে ফিরে এসেছে তা চোখ নিয়ে আইডি প্রবক্তাদের নতুন করে গজিয়ে ওঠা 'বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি' গুলো আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। আবারও চোখের গঠন নিয়ে তারা অনেক হৈ চৈ শুরু করছেন, তাদের মতে আমাদের চোখের গঠন এত জটিল, সুক্ষ্ম এবং নিখুঁত যে বুদ্ধিমান কোন স্রষ্টার ডিজাইন ছাড়া তা সৃষ্টিই হতে পারে না। ৫%, ১০%, সিকিভাগ বা অর্ধেক চোখ নাকি জীবের কোন কাজে আসতে পারে না। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স, ডঃ ইউজিন স্কট, ডঃ জেরি কয়েন, ডঃ কেনেথ মিলার

সহ অনেক বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই তাদের এই দাবিগুলোকে ভুল বলে প্রমাণিত করেছেন।

অনেকেই মনে করেন যে চোখের (কিংবা কান, পাখা, ফুসফুস ইত্যাদি) মত একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ মধ্যবর্তী পর্যায়গুলো স্বতন্ত্রভাবে ঠিকমত কাজ করতে পারবে না, এবং তার ফলে তাদের কোন উপযোগিতাই থাকতে পারে না। তারা আসলে এখানে বিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ দিকটিই বুঝতে পারেন না বা এড়িয়ে যেতে চান। আমরা আগেই দেখছি যে, জীবের কোন অংশকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃষ্টিকোন থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে আসার জন্য পুর্ণাংগভাবে বিকাশিত হতে হয় না। অন্ধ হওয়ার থেকে আংশিক দৃষ্টিশক্তি থাকা অনেক ভালো। আমাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিক্ষীণতার (myopia) বা দুরের বা কাছের দৃষ্টিহীনতার সমস্যা আছে, তার ফলে আমরা দুরে বা কাছে অস্পষ্ট দেখি। কিন্তু আমরা যদি আদিম কালের মত বন্য জীবন যাপন করতাম এই সীমাবদ্ধতাসহ চোখই আমাদেরকে অনেকখানি সুবিধা এনে দিতে পারতো। আমরা খাওয়া, আশ্রয়, সঙ্গী বা শিকারী পশুদের দেখতে পেতাম, তাদের নড়াচড়া বুঝতে পারতাম। যে জনসমষ্টির মধ্যে কোন দৃষ্টিশক্তিই নেই বা খুবই সীমিত দৃষ্টিশক্তি আছে তাদের জন্য চোখের উদ্ভব বা চোখের মত যে কোন অঙ্গের বিন্দুমাত্র উন্নতিই অনেক বাড়তি সুবিধা এনে দেবে। একেবারেই দর্শনশক্তি না থাকা মানে হচ্ছে সে পুরোপুরিই অন্ধ, এখন প্রাণীটির মধ্যে যদি অর্ধেক বা সিকিভাগ দৃষ্টিক্ষমতাও বিকাশ লাভ করে তাহলেই সে কিছু হলেও তার শিকারীর গতিবিধি দেখতে পাবে বা বুঝতে পারবে। চোখের এইটুকু আংশিক বিকাশই প্রাণীটির বেঁচে থাকা বা না থাকার মধ্যে বিশাল একটি ভুমিকা রাখতে পারে। একই যুক্তি খাটে পাখার ক্ষেত্রেও, আমরা চারপাশে আংশিক পাখাসহ প্রচুর প্রাণী দেখতে পাই। টিকটিকি, ব্যাঙ, শামুক জাতীয় গ্লাইড করে চলে এমন অনেক প্রাণীর মধ্যেও আংশিক পাখার মত অংশ দেখতে পাওয়া যায়। গাছে থাকে এমন অনেক প্রাণীর দুই জয়েন্টের মাঝখানে পাখার মত একধরনের চামড়ার অস্তিত্ব দেখা যায় যেটা আংশিকভাবে বিকশিত পাখা বৈ আর কিছু নয়। পাখাটি কত ছোট বা বড় তা এখানে ব্যাপার নয়, প্রাণীটি যদি কখনও গাছ থেকে পড়ে যায় তাহলে ওইটুকু পাখা ব্যবহার করেই সে তার জীবন বাঁচাতে পারবে যা কিনা তাকে টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা জোগাবে।

আইডি প্রবক্তাদের আরেকটি অতিপ্রিয় যুক্তি হচ্ছে চোখের নিখুঁত গঠন যা তাদের মতে কোন বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়া সৃষ্টিই হতে পারে না। আর অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন যেহেতু শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আরও উন্নততর রূপে পরিণত হয়, তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রাণীর মধ্যে অনেক ত্রুটিপূর্ণ অংগপ্রত্যংগ দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে এখন দেখা যাক আইডি-ওয়ালারা যেমনটি দাবী করছেন, মানুষের চোখ আসলেই সেরকম ত্রুটিহীন বা নিখুঁত কিনা। চোখের অক্ষিপটের (Retina) ভিতরে একধরনের আলো-গ্রহনকারী (Photoreceptor or photo cells) কোষ আছে যারা বাইরের আলো গ্রহন করে এবং তারপর একগুচ্ছ দর্শন স্নায়ুর (Optic nerve or ganglion cells) মাধ্যমে তাকে মস্তিষ্কে পৌঁছানোর ব্যবস্হা করে, যার ফলে আমরা দেখতে পাই। কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা নিশ্চয়ই জালের মত করে ছড়িয়ে থাকা এই স্নায়ুগুলোকে আলো গ্রহনকারী কোষগুলোর সামনের দিকে বসিয়ে দেবেন না! কারণ তাহলে তো বেশ কিছু আলো বাধা পাবে, আমরা এই বাধাটুকু না থাকলে যতখানি দেখতে পেতাম তার থেকে কম দেখতে পাবো এবং এর ফলে আমাদের দৃষ্টির মান অনেক কমে যাবে! কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, বাস্তবেই আমাদের চোখ ওরকম। আমাদের অক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মত ছড়ানো থাকে, শুধু তাই না, এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে, এর ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টশক্তি কিছুটা হলেও কমে

যায়।

স্নায়ুগুলোর এই অসুবিধাজনক অবস্থানের কারনে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে । এই স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌছানোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নেয়। এর ফলে একটি অন্ধবিন্দু (blind spot)-এর সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রত্যেকের চোখেই এক মিলিমিটারের মত জায়গা জুড়ে এই অন্ধবিন্দুটি রয়েছে, আমরা আপাতভাবে বুঝতে না পারলেও ওই জায়গাটিতে আসলে আমাদের দৃষ্টি সাদা হয়ে যায়।

তাহলে কি চোখ সৃষ্টির সময় এই সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় খোলা ছিলো না? তাও তো ঠিক নয়! আমাদের সামনেই এরকম প্রাণীরও উদাহরণ তো রয়েছে যাদের স্নায়ুগুলো খুব নিখুঁতভাবে আলো-গ্রহনকারী কোষগুলোর পিছনে বসানো আছে! স্কুইড এবং অকটোপাসেরও আমাদের মতই একধরনের লেন্স-এবং-অক্ষিপটসহ চোখ আছে, যার প্রয়োজনীয় স্নায়ুগুলো অক্ষিপটের পিছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোন অন্ধবিন্দু-এর সৃষ্টি হয়নি। আসলে বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের চোখের এই সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিকে কে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। বিবর্তন কাজ করে শুধুমাত্র ইতিমধ্যে তৈরী বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে নতুন করে কিছু সৃষ্টি বা বদল করতে পারে না। মেরদন্ডী প্রাণীর চোখ সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশকে পরিবর্তন করে যা অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছিলো, বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের এই অংশটি পরিবর্তিত হতে হতে আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা লাভ করেছে। মস্তিষ্কের এই সংবেদনশীল কোষগুলো অক্ষিপটের আকার ধারণ করলেও মস্তিষ্কের পুরোনো মূল গঠনটি তো আর বদলে যেতে পারেনি, তার ফলে এই জালের মত ছড়িয়ে থাকা স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে মলাষ্ক (স্কুইড বা অকটোপাস) জাতীয় প্রাণীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের অংশ থেকে নয়। এক্ষেত্রে ত্বকের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের মত ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভিতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই স্নায়ুগুলো মলাষ্কের চোখের অক্ষিপটের সামনে নয় বরং পিছনেই রয়ে গেছে। আমাদের চোখ যদি এভাবে লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তিত না হয়ে কোন পূর্বপরিকল্পিত ডিজাইন থেকে তৈরী হত তাহলে হয়তো চোখের এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিজ্ঞানীদেরও আর মাথা ঘামাতে হত না।

আণবিক জীববিজ্ঞানের কথা না উল্লেখ করলে চোখ নিয়ে আলোচনা তো সম্পূর্ণই হবে না। বিগত কয়েক দশকে জীববিজ্ঞানের এই শাখাটি রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। জীববিজ্ঞানের মূল গবেষণা এখন চোখের মত ‘বড় কাঠামো’ থেকে সরে এসে তার কোষে এসে ঠেকেছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফলগুলো রীতিমত বিস্ময়কর। দেখা গেছে, কীট-পতঙ্গের চোখের সাথে মানুষের চোখের কাঠামোগত যত বৈসাদৃশ্যই থাকুক না কেন, এরা একই ধরনের বংশানুসৃত দ্রব্য দিয়ে তৈরী। আলোর প্রতি সংবেদনশীল প্রোটিন Opsins এবং Pax6 নামে একটি প্রধান নিয়ামক জিন (master controll gene) খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা যা দিয়ে তারা ইঁদুর থেকে শুরু করে ফ্রুট ফ্লাই এবং ফ্রুট ফ্লাই থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকল প্রজাতির চোখের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে পারেন[৩৫]। শুধু তাই নয় অন্ধ ড্রসোফিলার মধ্যে এ জিনটি প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিমভাবে চোখের উদ্ভবও ঘটানো হয়েছে [৩৫, ৩৬]। এই জিনের আবিস্কার চোখের বিবর্তনের ধারাটিকে আরো স্পষ্ট ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এ কারণেই নেইল শ্যাঙ্কস তার ‘গড দ্য ডেভিল এন্ড ডারউইন’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন - ‘চোখের ব্যাপারটা বিবর্তনবাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠার বদলে বরং আজ বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ হিসেবেই বরং আবির্ভূত

হয়েছে।' [১২]

লিহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নবিদ ডঃ মাইকেল বিহে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের একজন অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর 'Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution' (১৯৯৬) বইটয়া নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক কালে ইনটেলিজেন্ট ডিজাইনের সমর্থনে সবচেয়ে শক্তিশালী বই। এ বইয়ে ডঃ বিহে হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা (Irreducible complexity) নামে একটি নতুন শাব্দিক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন, সরল অবস্থা হতে জটিল জীবজগতের সৃষ্টি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হতে পারেনা। কিন্তু 'হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা'- জিনিসটা কি? ডঃ বিহে তার বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন [৩২] :

> 'যে সমস্ত জৈব তন্ত্র (Biological system) নানা ধরনের, পর্যায়ক্রমিক, কিংবা সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোনভাবেই গঠিত হতে পারে না, তাদের আমি 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' (Irreducible complex) নামে অভিহিত করি। 'হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা' আমার দেওয়া এক বর্ণাঢ্য শব্দমালা যার মাধ্যমে আমি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় (interaction) অংশ নেওয়া একাধিক যন্ত্রাংশের একটি সিস্টেমকে বোঝাই - যার মধ্য থেকে একটি অংশ খুলে নিলেই সিস্টেমটি আর কাজ করবে না।'

বিহে পুরো ব্যাপারটি বোঝাতে মানুষের ডিজাইন করা ইঁদুর ধরার কলের (mouse trap) উদাহরণ হাজির করেছেন। এ সাধারণ যন্ত্রটির মধ্যে থাকে ১) কাঠের পাটতন, (২) ধাতব হাতড়ি যার সাহায্যে ইদুর মারা হয়, (৩) স্প্রিং যার শেষ মাথাটি হাতুড়ির সাথে আটকানো থাকে, (৪) একটি ফাঁদ যা স্প্রিংটিকে বিমুক্ত করে (৫) এবং একটি ধাতব দন্ড যা ফাঁদের সাথে যুক্ত থাকে এবং হাতুরীটিকে ধরে রাখে। বিহের যুক্তি হল শুধু প্ল্যাটফর্ম বা স্প্রিং এর সাহায্যে ইঁদুর ধরা যায় না। ইঁদুর তখনই কলে ধরা যাবে যখন পুরো সিস্টেমের সকল যন্ত্রাংশগুলো এক সাথে কাজ করবে। যে কোন একটি যন্ত্রাংশকে খুলে ফেললেই ইঁদুর ধরার কলের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই বিহের মতে, এটি একটি 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' সিস্টেমের ভাল উদাহরণ। ঠিক একইভাবে বিহে মনে করেন প্রকৃতিতে ব্যকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলামগুলো 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল'। এ ফ্ল্যাজেলামগুলোর প্রান্তদেশে এক ধরনের জৈব-মোটর আছে যেগুলোকে ব্যাকটেরিয়ার কোষগুলো স্ব-প্রচালনের (self-propulsion) কাজে ব্যবহার করে। তার সাথে চাবুকের মত দেখতে এক রকমের প্রপেলারও আছে, যেগুলো ওই আনবিক মোটরের সাহায্যে ঘুরতে পারে। প্রোপেলারগুলো একটি 'ইউনিভার্সাল জয়েন্টের' মাধ্যমে মোটরের সাহায্যে লাগানো থাকে। মোটরটি আবার এক ধরনের প্রোটিনের মাধ্যমে জায়গামত রাখা থাকে, যেগুলো বিহের মতে স্ট্যাটরের ভূমিকা পালন করে। আরেক ধরনের প্রোটিন বুশিং পদার্থের ভূমিকা পালন করে যার ফলে চালক-স্তম্ভদন্ড (drive shaft)টি ব্যাকটেরিয়ার মেমব্রেনকে বিদ্ধ করতে পারে। বিহে বলেন, ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলামকে ঠিকমত কর্মক্ষম রাখতে ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন সম্মিলিত ভাবে কাজ করে। যে কোন একটি প্রোটিনের অভাবে ফ্ল্যাজেলাম কাজ করবে না, এমন কি কোষ গুলোও ভেঙ্গে পড়বে।

জীববিজ্ঞানীরা বিহের সবগুলো যুক্তিকেই খন্ডন করেছেন। বিহের উদাহরণে বর্ণিত ওই ইদুঁর ধরার কলটির কথাই ধরুন। কলটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে এর ফাঁদ এবং ধাতব দন্ডটি সরিয়ে নিন। এবার আপনার হাতে যেটি থাকবে সেটি আর ইঁদুরের কল নয়; বরং অবশিষ্ট তিনটি যন্ত্রাংশ দিয়ে গঠিত মেশিনটিকে আপনি সহজেই টাই ক্লিপ কিংবা পেপার ক্লিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এবারে

স্প্রিংটিকে সরিয়ে নিন। এবারে আপনার হাতে থাকবে দুই-যন্ত্রাংশের এক চাবির চেইন। আবার প্রথমে সরিয়ে নেওয়া ফাঁদটিকে মাছ ধরার ছিপ হিসেবেও আপনি ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক যেমনি ভাবে কাঠের পাটাতনটিকে ব্যবহার করতে পারেন 'পেপার-ওয়েট' হিসেবে। অর্থাৎ যে সিস্টেমটিকে এতক্ষণ 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' বলে ভাবা হচ্ছিল, তাকে আরো ছোট ছোট ভাগে ভেঙ্গে ফেলে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায়।

ব্যকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলাম গুলোর ক্ষেত্রে আসা যাক। বিহে যেমন ভেবেছিলেন কোন প্রোটিন সরিয়ে ফেললে ফ্ল্যাজেলাম আর কাজ করবে না, অর্থাৎ পুরো সিস্টেমটিই অকেজো হয়ে পড়বে, তা মোটেও সত্যি নয়। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কেনেথ মিলার পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন সরিয়ে ফেলার পরও ফ্ল্যাজেলামগুলো কাজ করেছে; বহু ব্যাকটেরিয়া এটিকে অন্য কোষের ভিতরে বিষ ঢেলে দেওয়ার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, ফ্ল্যাজেলামের বিভিন্ন অংশগুলোর আলাদা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজ থাকলেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সুবিধা পেতে পারে। জীববিজ্ঞানে এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক সময় এক উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে সরীসৃপের চোয়ালের হাড় থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানের উৎপত্তি। আজকে আমাদের কানের দিকে তাকালে ওটাকে 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আদিতে তা ছিল না। এমন নয় যে, হঠাৎ করেই একদিন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কব্জাবিহীন চোয়ালের হাড়্গুলো ঠিক করল তারা কানের হাড়ে পরিণত হয়ে যাবে; বরং এর জন্য বিবর্তনের পথ ধরে ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়েই তারা আজকের রূপ ধারণ করেছে। কাজেই উৎপত্তির সামগ্রিক ইতিহাস না জেনে শুধুমাত্র চোখ, কান কিংবা ফ্ল্যাজেলামের দিকে তাকালে ওগুলোকে 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' বলে মনে হতে পারে বৈকি।

এ যুগের প্রথিতযশাঃ সংশয়বাদী, টেনিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মাসিমো পিগ্লিউসি তাঁর 'Design yes, intelligent no: a critique of intelligent design theory and neo-creationism' প্রবন্ধে বলেন, জীবজগতে হয়ত বেশ কিছু উদাহরণ থাকতে পারে যেগুলোকে জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তন তত্ত্বের আলোকে এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না; কারণ জীববিজ্ঞানীদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই। কাজেই এটি মূলতঃ অজ্ঞতা সূচক যুক্তি (Argument from ignorance), কখনই বিহের তথাকথিত Irreducible complexityর প্রমাণ নয়। আমরা এ প্রবন্ধে আগেই উলেখ করেছি যে, উইলিয়াম প্যালে যখন প্রথম আঠারো শতকে 'আর্গুমেনট অব ডিজাইন' বা সৃষ্টির অনুকল্পের অবতারণা করেছিলেন, তখন তিনি চোখের গঠন দেখে যার পর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্যালে ভেবেছিলেন চোখের মত একটি জটিল প্রত্যংগ কোন ভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে বিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনের জীববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে চোখের বিবর্তনের ধাপগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন। ম্যাট ইয়ং তার 'Grand Designs and Facile Analogies: Exposing Behe's Mousetrap and Dembski's Arrow' প্রবন্ধে বলেন: 'আধা-চোখের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না দেখে ডঃ বিহে এখন আধা ফ্ল্যাজেলামের যুক্তি হাজির করেছেন; আর একটা গালভরা নামও খুঁজে বের করেছেন -'ইরিডিউসিবল কম্পলেক্সিটি'। কিন্তু এটি ওই পুরোনো আধা চোখের যুক্তিই। আর গালভরা পরিভাষা বাদ দিলে এটি শেষ পর্যন্ত ওই অজ্ঞতাসূচক যুক্তি বা God in gaps।' [৩৩]

এবারে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' এর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক[৩৪]। ধরা যাক মাধ্যাকর্ষণের কথা। নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করেছিলেন যাকে আমরা

বলি নিউটনীয় ধ্রুবক, বা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট। নিউটন তার সেই বিখ্যাত সূত্রে দেখিয়েছিলেন, দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণবলের পরিমান ঠিক কতটা হবে সেটা নির্ণয়ে এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট নামের রাশিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ওই ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত আকর্ষণ বলের পরিমাণও যেত বদলে। সাদা চোখে মনে হবে যে ব্যাপারটা সামান্যই, আকর্ষণ বল বদলালেও বোধ হয় তেমন কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ওই ধ্রুবকের মান আসলে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ওটার মান এখন যা আছে তা না হয়ে যদি অন্য ধরণের কিছু হত তা হলে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডটাই হত অন্যরকম। ওই ধ্রুবকের মান ভিন্ন হলে তারাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে দিত বদলে। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর উপরই নয়, মহাকর্ষ এবং দুর্বল পারমাণবিক বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তাঁরা দেখিয়েছেন, দুর্বল পারমাণবিক বলের শক্তি যদি একটু বেশী হত, এই মহাবিশ্বে পুরোটাই মানে শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেনে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেনের একটি মাসতুত ভাই, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আইসোটোপ') আর হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তিমত্তা আরেকটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে শতকরা একশ ভাগই হত হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যোগ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাধা দিত। কাজেই এ দু' চরম অবস্থার যে কোন একটি সঠিক হলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজি তৈরী হওয়ার মত অবস্থাই কখনও তৈরী হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরণীতে কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার,বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের ভর মাপতে গিয়ে দেখেছেন এই ভর নিউট্রন-প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোতে পরিনত হতে পেরেছে।

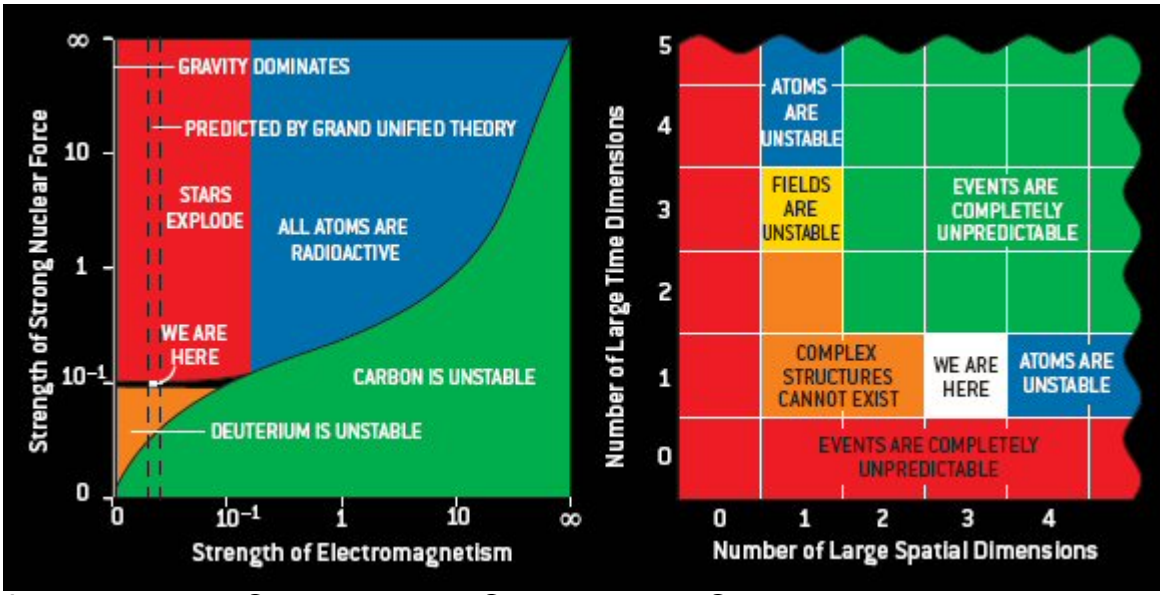

চিত্র ১০.৪ : অনেক বিজ্ঞানী বলেন মহাবিশ্বের খুব সীমিত পরিসরের মধ্যে জীবনের বিকাশ ঘটেছে; এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে।

যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশী হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর উৎপন্ন সমস্ত ইলেকট্রন আর প্রোটন সব একসাথে মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিণত হয়ে যেত। এর ফলে যেটা ঘটত সেটা আমাদের

জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে খুব কম পরিমানে হাইড্রোজেনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত আর তা হলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানীই হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না।

জন ডি. ব্যারো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের নানা ধরনের রহস্যময় 'যোগাযোগ' তুলে ধরে একটি বই লিখেছেন ১৯৮৬ সালে, নাম- 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমলজিকাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি মানুষের আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল - সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটে নি, ররং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার (বিধাতার) একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ম-নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' বা 'নরত্ববাচক যুক্তি'। গণিতবিদ এবং দার্শনিক ডঃ উইলিয়াম ডেম্বস্কি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology' বইয়ে তথ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, আমাদের এই মহাবিশ্বের ভিতর যে ধরনের বিমূর্ত তথ্য লুকানো আছে তা কোন ভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট হতে পারে না।

এধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে খুব আকর্ষণীয় দেখালেও, অনুসন্ধিৎসু সংশয়বাদী চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ ব্যারো এবং টিপালার যে যুক্তি দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে এটি ধরেই নেওয়া হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া আর অন্য কোনভাবে প্রাণ সৃষ্ট হতে পারবে না। এই সজ্ঞাত ধারণাটি কখনই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। যেমন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু কার্বনের পাশাপাশি সিলিকন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশকেও ইদানিং কালে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। প্রকৃতিতে পাওয়া ডায়াটমগুলো (জীববিজ্ঞানের ভাষায় এগুলো এক ধরনের eukaryotic algae) এমনি একটি উদাহরণ। আবার আমরা প্রায়শঃই শুনি যে, আমাদের পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি সঠিক অনুপাতে না থাকত, তবে নাকি প্রাণের বিকাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীটা ২৩.৫ ডিগ্রীতে হেলে আছে, তার এক চুল এদিক ওদিক হলে তাপ আর চাপের এমন বৈষম্য তৈরী হত যে, প্রাণ সৃষ্টিই অসম্ভব একটি ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেকেই প্রাণের এই ধরনের 'সঙ্কীর্ণ' সংজ্ঞার সাথে একমত পোষণ করেন না। তারা বলেন, আমরা ওই ধরণের 'সর্বোত্তম' পরিবেশে বিকশিত হয়েছি বলে আমরা মনে করি প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক ওধরণের পরিবেশই লাগবে। যেমন, বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, চাপ, তাপ ইত্যাদি। এগুলো ঠিক ঠিক অনুপাতে না থাকলে নাকি জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা, প্রামাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন বিকাশের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নীচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। ষাটের দশকে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী টমাস ব্রক (Thomas Brock) এবং তার সহকর্মীরা ওয়াইওমিং এর ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উষ্ণ প্রস্রবনে এক ধরনের সরলাকৃতির অণুজীব (Microbes) আবিষ্কার করেন [৩৭]। কোন বহুকোষী জীবই সাধারণতঃ এই তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে না। সমুদ্রের গভীর তলদেশে এমনকি কেরসিন তেলের ভিতরের বৈরী পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে - যে পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের সংজ্ঞায়িত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোনই মিল নেই। যে সমস্ত 'প্রাণ' এই ধরনের ভয়ংকর বৈরী পরিবেশে টিকে থাকতে পারে তাদেরকে বলা হয় চরমজীবী (Extremophile)। পৃথিবীতে বেশ কয়েক ডজন চরমজীবীর অস্তিত্ব রয়েছে।

কাজেই হলফ করে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান অন্যরকম হলে এই মহাবিশ্বে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ অধ্যাপক ভিকটর স্টেংগর তার 'The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' বইয়ে দেখিয়েছেন চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতই অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশ উদ্ভব ঘটতে পারে। এর জন্য কোন সূক্ষ্ম সমন্বয় বা 'ফাইন টিউনিং' এর কোন প্রয়োজন নেই। ডঃ স্টেংগর যখন বলেন, 'সূক্ষ্ম-সমন্বয়বাদীদের দাবীর এমন কোন ভিত্তি নেই যাতে তারা অনুমান করতে পারেন যে, একমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়া জীবন সৃষ্টি অসম্ভব'- তখন সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপায় থাকে না। এছাড়াও 'Physical Review' জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে অ্যান্থনি অ্যাগুরি (Anthony Aguirre) স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন, মহাবিশ্বের ছয়টি প্যারামিটার বা পরিবর্ত্য রাশিগুলো বিভিন্নভাবে অদলবদল করে গ্রহ, তারা এবং পরিশেষে কোন একটি গ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব - কোন ধরনের 'Anthropic Argument'-এর আমদানী ছাড়াই [৩৮]।

ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্বের[৩৯] সাম্প্রতিক ফলাফলগুলোও তথাকথিত 'ফাইন-টিউনিং'-এর ধারণাগুলোকে প্রত্যাখান করছে। ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে প্রখ্যাত পদার্থবিদ আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের মহাবিশ্বের মতই বাস্তবে আরো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে। একাধিক মহাবিশ্বের ধারণাটি কোন ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা নয়, নয় কোন স্টারট্রেক মুভি বা আসিমভের সায়েন্সফিকশন। অতি সংক্ষেপে অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যক্ত করা যায় এভাবে [৪০] :

> আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়ত বাস্তবে ঘটেছেও। এই একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ব্যাপারটি প্রাথমিকভাবে ট্রিয়ন, অ্যালেন গুথ, আর পরবর্তীতে মূলতঃ আদ্রে লিন্ডের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলা হয়ে থাকে সৃষ্টির উষালগ্নে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে প্রসারণশীল বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।

মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা কিন্ত শেলের মতই আঘাত করেছে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'-এর প্রবক্তাদের বুকে। কারণ, সাদা মাঠা কথায় এ তত্ত্ব বলছে যে, হাজারো-লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের ভীরে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। স্রেফ সম্ভাবনার নিরিখেই এমন একটি মহাবিশ্বে চলকগুলোর মান এমনিতেই এত সূক্ষভাবে সমন্বিত হতে পারে, অন্যগুলোতে হয়ত হয়নি। আমাদের মহাবিশ্বের চলকগুলো আকস্মিকভাবে এই রূপে সমন্বিত হতে পেরেছে বলেই এতে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে; এতে এত আশ্চর্য হবার কিছু নেই! কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েল সোসাইটি রিসার্চ প্রফেসর মার্টিন রীস সেটিই খুব চমৎকারভাবে একটি উপমার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন [১২] :

'অসংখ্য মহাবিশ্বের ভীরে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। অন্য মহাবিশ্বে বিজ্ঞানের সূত্র আর চলকগুলো হয়ত একেবারেই অন্যরকম হবে।... কাজেই ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্য এখানে একেবারেই অচল। তার বদলে বরং আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডকে অনেকটা পরিত্যক্ত সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়ের দোকানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। **দোকানের মজুদ যদি বিশাল হয় তবে দোকানের কোন একটি জামা আপনার গায়ে ঠিকমত লেগে গেলে আপনি নিশ্চয় তাতে বিস্মিত হবেন না!** ঠিক একইভাবে আমাদের মহাবিশ্ব যদি ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মহাবিশ্বের একটি হয়ে থাকে, দোকানের একটি জামার মতই সূক্ষ-সমন্বয় দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

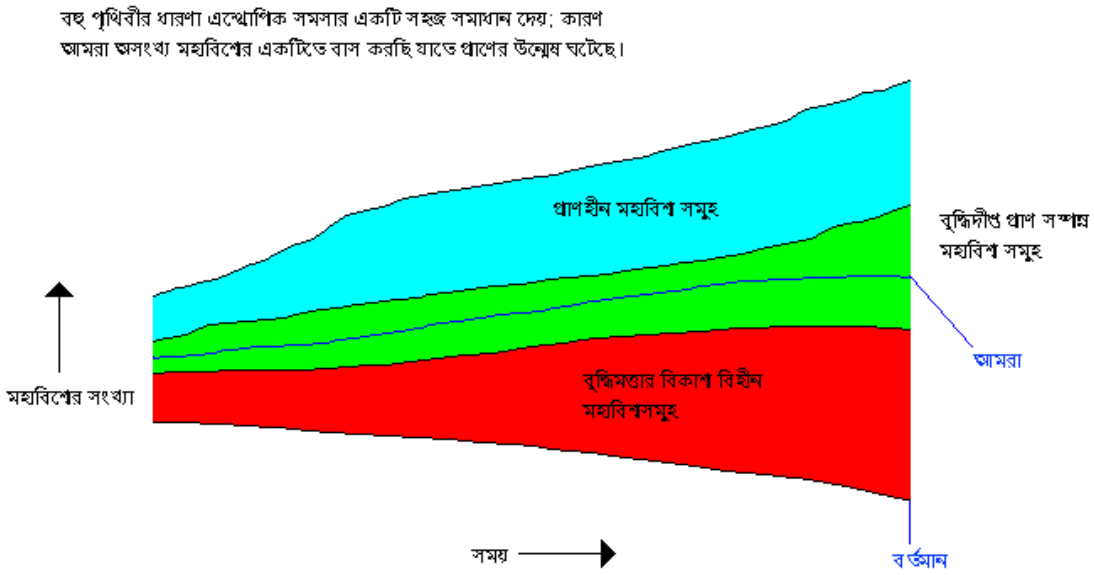

চিত্র ১০.৫ : মালটিভার্স হাইপোথিসিস অ্যান্থ্রোপিক এবং ফাইন-টিউনিং আর্গুমেন্টের একটি সহজ সমাধান দেয়।

'ফাইন টিউনিং' আর্গুমেন্টের এর সমালোচনা করেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গও। তিনি 'A Designer Universe?' প্রবন্ধে এ ধরনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেন :

'কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কিছু ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সূক্ষ-সমন্বয় (fine-tune) ঘটেছে যেগুলো জীবন গঠনের সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এ ভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পণা করে বিজ্ঞানের সব রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এই ধরনের সুক্ষ্ম-সমন্বয়ের ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই।'

মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিকটর স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্স সহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন এই 'ফাইন টিউনিং' বা 'এনথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো সেই পুরোন 'গড ইন গ্যাপস' আর্গুমেন্টেরই নয়া সংস্করণ। যেখানে রহস্য পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ব্যাখ্যা করা

যাচ্ছে না, সেখানেই অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছু আমদানী করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে। এভাবে মুক্ত-বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান চর্চকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে প্রকারন্তরে নতি স্বীকারে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে।

আসলে অনেক বিজ্ঞানীই আজ এই মতের সাথে পুরোপুরি আস্থাশীল যে, মহাবিশ্ব মোটেও আমাদের জন্য 'ফাইন টিউনড' নয়, বরং আমরাই এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে 'ফাইন টিউন্ড' করে গড়ে নিয়েছি। ব্যাপারটা হয়ত মিথ্যে নয়। আবারও আমাদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত -এই সীমার তড়িচ্চুম্বক বর্ণালিতেই কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল, আমাদের বায়ুমন্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। কাজেই সেই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের চোখও সেভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। এখন এই পুরো ব্যাপারটিকে কেউ উলটোভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। বলতে পারেন যে, কোন এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বা আমাদের চোখকে কে লাল থেকে বেগুনী আলোর সীমায় সংবেদনশীল করে গড়বেন বলেই বায়ুমন্ডলের মাধ্যমে তিনি সেই সীমার মধ্যবর্তী পরিসরের আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করাটা কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতনই শোনায়। তারপরও 'ফাইন টিউনার'রা ঠিক এভাবেই যুক্তি দিতে পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান এরকম কেন, বৈজ্ঞানিকভাবে এটি না খুঁজে এর ব্যাখ্যা হিসেবে 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এই ধরণের যুক্তি হাজির করেন। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মূখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরণের পর সৃষ্টিকর্তা কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে, আর তারপর আরো ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন 'মানবতার উন্মেষ' ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পৃথিবী উৎপত্তির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন?

আসলে শতাব্দী-প্রাচীন 'মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভুত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছেই না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে এসেছি। আমাদের এই পৃথিবীটা যে মহাকাশের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা নিতান্ত সাধারণ গ্রহ মাত্র, -এটি যে কোন কিছুরই কেন্দ্রে নয় - না সৌরজগতের, না এই বিশাল মহাবিশ্বের - এ সত্যটি গ্রহণ করতে মানুষের অনেকটা সময় লেগেছে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিলে এর বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয় এই ভয়েই বোধ হয় টলেমীর 'ভূ-কেন্দ্রিক' মডেল জনমানসে রাজত্ব করেছে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে, আর ধর্ম বিরোধী সত্য উচ্চারণের জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিওদের সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) যখন চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও 'মন থেকে নিতে পারে নি' কারণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়ে যায়! এই সংস্কারের ভুত এক-দু দিনে দূর হবার নয়। তাই রহস্য দেখলেই, জটিলতা দেখলেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির কেন্দ্রে রেখে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বসিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। 'ফাইন-টিউনিং' আর 'অ্যানথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো এজন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত' অনুকল্পটি (জীববিজ্ঞান এবং জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই) কিছু গোঁড়া খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত একটি বিশ্বাস-নির্ভর ধারণার চতুর অভিব্যক্তি মাত্র এবং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িতও নয় যে এটির সত্যতা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কখনও নির্ণীত হওয়া সম্ভব। সেজন্যই এটি কখনও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগেই মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। তার পরেও এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও 'ফাঁক' রয়ে গেছে; রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জটিল কিছু দেখলেই বিজ্ঞান তার পেছনে কোন সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে এত সহজেই বৈধতা দিয়ে দেবে। সরল সিস্টেম থেকে জটিল সিস্টেমের বিকাশের উদাহরণ প্রকৃতিতে খুঁজলেই অনেক পাওয়া যাবে। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, কিংবা বাতাস আর পানির ঝাপটায় পাথুরে জায়গায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতেই আছে। যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে বিচিত্র নক্সার হিমবাহ, কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর পশ্চিমাকাশে উদয় হয় বর্ণিল রংধনুর, মুগ্ধ হয় আমাদের অনেকের মন, কিন্তু আমরা কেউ এগুলো তৈরী হওয়ার পেছনে আমরা কেউ সজ্ঞাত সত্ত্বার দাবী করি না। কারণ আমরা সবাই জানি ওগুলো সবই তৈরী হয় কোন সজ্ঞাত সত্ত্বার হস্তক্ষেপ ছাড়াই, পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলো প্রাণহীন নিয়মকে অনুসরণ করে। ক্যালস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এমিরিটাস অধ্যাপক মার্ক পেরাখ সম্প্রতি 'Unintelligent Design' নামে একটি বই লিখেছেন। বইটিতে তিনি উইলিয়াম ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে আর ফিলিপ জনসন সহ অন্যান্য আই.ডি প্রবক্তাদের সমস্ত যুক্তি খন্ডন করে উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, আই.ডি কখনই বিজ্ঞান নয়, বরং ছদ্মবেশী বিজ্ঞান, যাকে ইংরেজীতে আমরা বলি pseudoscience. ডঃ পেরাখ তার বইয়ে নিত্যদিনের বেশ কিছু সাধারণ উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন, জটিলতা মানেই বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নয়, অনর্থক জটিলতা বরং প্রকারন্তরে বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ করে। তাঁর ভাষায়, 'কোন যন্ত্র তা সে মেকানিকালই হোক আর বায়োমেকানিকালই হোক, যদি অতিরিক্ত জটিল হয়, তা বরং বুদ্ধিহীন উৎসের দিকেই নির্দেশ করে' (আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, মার্ক পেরাখ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২৬)। কাজেই মহাবিশ্বের কিংবা জীবজগতের জটিলতাকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের প্রমাণ ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আর তাছাড়া আই.ডির বিরুদ্ধে সবচাইতে বড় যুক্তি তো হাতের সামনেই রয়ে গেছে। আমাদের এই 'জটিল' মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে ব্যখার জন্য যদি কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার সত্যই প্রয়োজন হয়, তবে ধরেই নেওয়া যেতে পারে সেই বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বাকে এই মহাবিশ্বের চেয়েও জটিল কিছু হতে হবে। তা হলে সেই জটিল বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করবার জন্য ওই একি যুক্তিতে আবার ততোধিক জটিল কোন সত্ত্বার আমদানী করতে হবে, এমনি ভাবে জটিলতর সত্ত্বার আমদানীর খেলা হয়ত চলতেই থাকবে একের পর এক। এ ধরনের যুক্তি তাই আমাদেরকে অনর্থক অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেয়, যা বার্ট্রান্ড রাসেল এবং ডেভিড হিউমের মত দার্শনিকেরা অনেক আগেই অগ্রহণযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত না আই.ডি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যুক্তি আর সংশয়বাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আই.ডি প্রবক্তাদের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ছে না বলেই মনে হচ্ছে।

সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তন: এর শেষ কোথায়?

আইডি-ওয়ালাদের চেয়ে বরং প্রগতিশীল অবস্থানে আছেন 'বিশ্বাসী বিবর্তনবাদী' (theistic evolutionist) দের দল। তাঁরা মনে করেন ঈশ্বর এক সময় পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ ঘটালেও পরবর্তীতে আর এতে হস্তক্ষেপ করেননি, বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণকে বিকশিত হতে দিয়েছেন। প্রয়াত পোপ জন পল ২ এ ধরনের বিশ্বাসী বিবর্তনবাদী ছিলেন যিনি বিবর্তনকে বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রতিটি যুগেই সৃষ্টিবাদীরা বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাকে ঠেকানোর নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছে। বিশেষতঃ যখনই ধর্মগ্রন্থের সাথে বিরোধ দেখেছে বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। বাইবেল-বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য গ্যালিলিও, ব্রুনোর মত বিজ্ঞানীকে করেছে নির্যাতন। তারপরও ঈশ্বর ও তার পুত্ররা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা থামাতে পারেননি। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব এখন সৃষ্টিবাদীরা মেনে নিলেও বাইবেলের বাণীকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে বিবর্তন ঠেকানোর প্রচেষ্টা এখনও কোন কোন মহলে লক্ষ্যনীয়। যেমন, 'ইয়ং আর্থ ক্রিয়েশনিস্ট'দের দল বাইবেলীয় ধারণায় বিশ্বাস করেন পৃথিবীর বয়স মাত্র ছ'হাজার বছর। বিগত কয়েক দশকে তাদের আস্ফালনও কিন্তু কমে এসেছে, কারণ আধুনিক রেডিও অ্যাকটিভ ডেটিং এর মাধ্যমে খুব নির্ভরযোগ্যভাবে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা গিয়েছে, যা বাইবেল বর্ণিত বয়সের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, মিলিয়ন বছর আগেকার ফসিলও আবিস্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানী ডগলাস ফুটুইমা 'সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তনের' একটি ধারাবাহিক ছবি তার 'ইভলুশন' বইতে উল্লেখ করেছেন এভাবে:

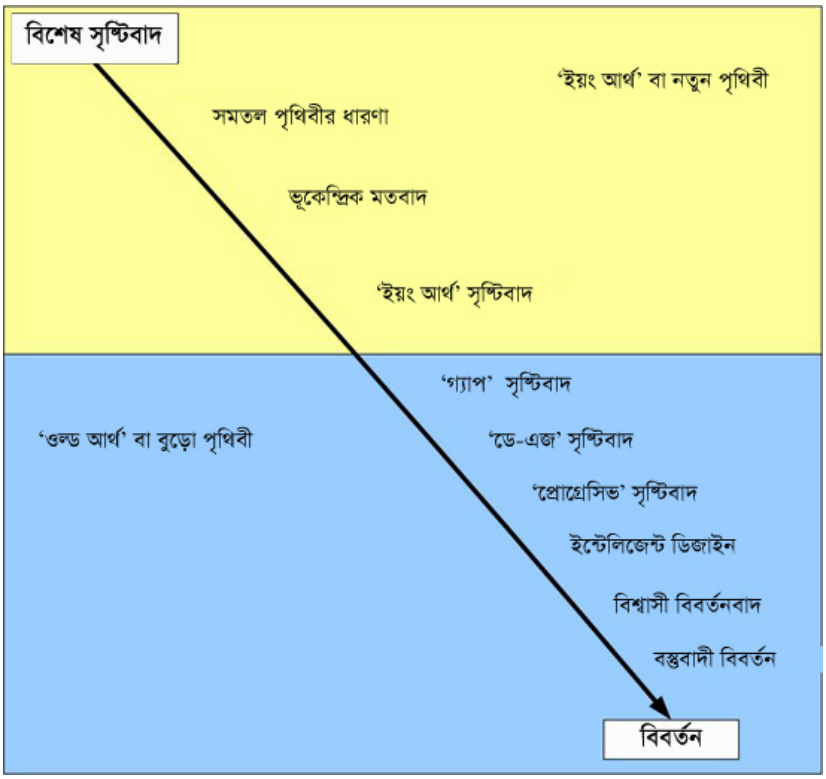

চিত্র : সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তনের রূপরেখা (Ref. Evolutionary science, creationism and society, Doglas J. Futuyama, Evolution, Sinauer Associates Inc. p525)

বিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেংগর এ প্রসঙ্গে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন :

> ‘The species of religious thought called creationism continues to evolve by a process of natural selection. While, as National Center for Science Education executive director Eugenie Scott has pointed out, there has always been a continuum of creationist views from extreme to moderate, we can still identify a few dominant strains.’

আমরা মনে করি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই ধীরে ধীরে একটা সময় জৈব বিবর্তনকে একটি বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, এবং শেষমেষ বুঝবেন জড়জগৎ এবং জীবজগতের সবকিছুই প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন আর বিকশিত হয়েছে এবং এ সবই ঘটেছে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায়, ঠিক যেভাবে কয়েক শো বছর লাগলেও শেষ পর্যন্ত সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো জনসাধারণের মধ্যে। জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, আণবিক জীববিদ্যার কোন শাখাই বিবর্তনের কোন সাক্ষ্যের বিরোধিতা তো করছেই না, বরং যত দিন যাচ্ছে বিবর্তনের ধারাটি সবার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ফসিল ছাড়াও, জেনেটিক্স এবং আণবিক জীববিদ্যার মত নতুন শাখাগুলো যেভাবে বিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শুরু করেছে, এটি এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তথ্যসূত্র:

(১) Shermer M, 2006, Why Darwin Matters, Time Books, New York.
380

(২) Angier N, 2004, My God Problem, Free Inquiry magazine, vol 24, no. 5.

(৩) Futuyma DJ, 2005, Evolution, Sinauer Associates, INC, MA, USA, p.523.

(৪) Why doesn't America believe in evolution?, 2006, New Scientist magazine, August 2006issue, p 11.
http://www.newscientist.com/channel/being-human/mg19125653.700-why-doesnt-america-believe-in-evolution.html

(৫) রশীদ হু, জুলাই ১৫, ২০০৬, পরীক্ষায় পাশের জন্য পড়ি, কালস্রোত বিভাগ, দৈনিক সমকাল।

(৬) Stenger V, Do Our Values Come from God?, The Evidence Says No, http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Godless/Values.htm

(৭) "We focus particularly on providing answers to questions surrounding the book of Genesis, as it is the most-attacked book of the Bible. We also desire to train others to develop a biblical worldview, and seek to expose the bankruptcy of evolutionary ideas, and its bedfellow, a “millions of years old” earth (and even older universe)." from ‘Our message’, Answer in Genesis,

http://www.answersingenesis.org/

(৮) Dennett DC, 1995, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and Meanings of Life, Penguin (UK), Simon and Schuster (USA).

(৯) White AD, 1993, A History of Warfare of Sceince with the theology in Christendom, Prometheus Books.

(১০) Rees M, 2001, Our Cosmic Habitat, Princeton University Press, p 163

(১১) Paley W, (1801) 1850, Natural Theology or Evidence of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature, American Tract Society.

(১২) Shanks N, 2004, God, the Devil and Darwin: A critique of Intelligent Design theory, Oxford University Press.

(১৩) বিস্তারিত তথ্যের জন্য Dawkins R, (1986) 1996, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without a Design, Norton Paperback এর 'Accumulating Small change' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।'

(১৪) Darwin C, (1859), 1999 The Origin of Species, Bantam Books, p 155.
(১৫) Kuhn T, 1970, The Structure of Scientific Revolutions, University Of Chicago Press, USA

(১৬) স্টেংগর ভি, ডারউইনিজমের আতংক, (অনুবাদ : বন্যা আহমেদ), জুন ২, ২০০৫, একুশ শতক বিভাগ, দৈনিক ভোরের কাগজ

(১৭) আজকের দিনের বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা অবশ্য প্রজাতির উৎপত্তির পেছনে **প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি** বিবর্তনের জন্য অন্য অনকে ফ্যাক্টর (যেমন জিন মিউটেশন, ক্রোমজম মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন, জেনেটিক ড্রিফট এবং অন্তরণ বা আইসোলেশন) খুঁজে পেয়েছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(১৮) Dawkins R, Darwin and Darwinism, Mukto-Mona Darwin Day celebration, http://www.mukto-mona.com/Articles/dawkins/darwin_and_darwinism120206.htm

(১৯) Huxley TH, 1880, The Origin of Species (review), *Westminster Review*, vol 17, pp 541-570

(২০) Mayr E, 1988, Toward a New Philosophy of Biology, Cambridge, Mass, Harvard University press.

(২১) Gould SJ, 2002, The Structure of Evolutionary Theory, Belknap Press

(২২) Dawkins R, 2004, A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love, Mariner Books; Reprint edition

(২৩) Berra TM, 1988, Evolution and Myth of Creationism, Stanford University Press, USA

(২৪) Stenger V, 2003, Has Science Found God? The Latest Results in the Search for the Purpose in the Universe, Prometheus Books, USA

(২৫) Creation Research Society [online], www.creationresearch.org

(২৬) Scott EC and Cole HP, 1985, The Elusive Basis of Creation 'Science', Quarterly Review of Biology, vol. 60, no. 1.

(২৭) Dennett DC, 2006, The Hoax of Intelligent Design and How It was Prepared, from Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement, Brockman J (Editor), Vintage.

(২৮) Coyne JA, 2006, The Faith That Dare NOT Speak Its Name, from Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement, Brockman J (Editor), Vintage

(২৯) Wells J, Darwinism: Why I Went for a Second Ph.D, The Words of the Wells Family, Kansas Citizens for Science. Source: http://www.tparents.org/library/unification/talks/wells/DARWIN.htm

(৩০) Dawkins R, 2006, Intelligent Aliens, from Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement, Brockman J (Editor), Vintage, pp 92.

(৩১) Perakh M, 2005, Intelligent Design Theory - A Quasi-Scientific Endeavor with a Religious Agenda, Mukto-Mona [online], www.mukto-mona.com

(৩২) Behe MJ, 1996, Darwin's Black Box : The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, USA.

(৩৩) Young M and Edis T [editors],(2004) 2006, Why Intelligent Design Fails: A Scientific Critique of the New Creationism, Rutgers University Press, London.

(৩৪) রায় অ, ২০০৫,আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রি, অঙ্কুর প্রকাশনী।

(৩৫) Halder G, Callaerts P, Gehring WJ, 1995, Induction of Ectopic Eyes by Targeted Expression of the eyeless Gene in Drosophila. Science, vol. 267, pp 1788-1792.

(৩৬) Gerhart J and Kirschner M, 1997, Embryos, and Evolution: Toward a Cellular and Developmental Understanding of Phenotypic Variation and Evolutionary Adaptability, Cells,

(৩৭) Brock TD, Life at High Temperature, History and Education, Inc, Yellowstone National Park, Wyoming.

(৩৮) Anthony A, 2001, The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic Arguments, Journal of Physical Rev, D64:083508.

(৩৯) বিস্তারিত তথ্যের জন্য Alan H. Guth,1998, The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Perseus Books Group দেখুন|

(৪০) Linde A, 1998, Self Reproducing Inflationary Universe, Scientific American.

একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির দশম অধ্যায়।}